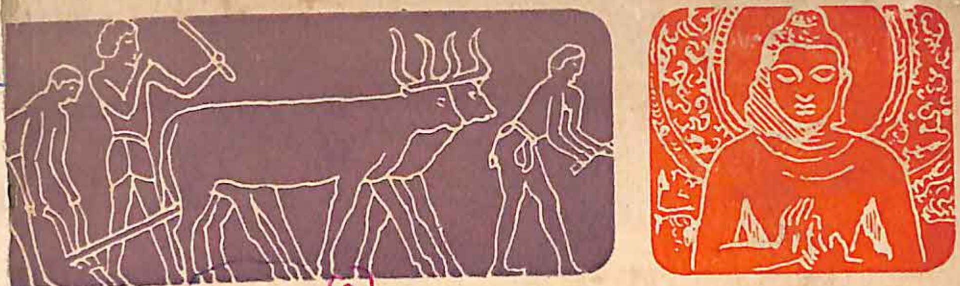




প্রাচীন পৃথিবী

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য





ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্
ডক্টর অমলেন্দু

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for class VI for all schools in West Bengal and Tripura State. Vide T. B. No. VI/H/79/37 Dated 5.12.1979.

প্রাচীন পৃথিবী

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

এম. এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক

ও

শ্রীঅমলেন্দু দে

এম. এ. (কলিকাতা); ডি. লিট. (যাদবপুর)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের গুরু নানক অধ্যাপক

বাণীমন্দির পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

197-B, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-700007

প্রকাশক :
বাণীমন্দির পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে
শ্রীদিব্যেন্দু দত্ত, বি. এস্-সি.

বিক্রয়-কেন্দ্র :
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮০
তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৮০
চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৮২
পঞ্চম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৮৩

Paper used for the printing of this book was made available by the Govt. of India through S.L.C. at a concessional rate.

মুদ্রাকর :
শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১১, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রিত সংখ্যা : ৮০০০

মূল্য : আট টাকা মাত্র

SYLLABUS ON HISTORY

Class VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS

	Pages	No. of Lessons
A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development)	1	1
(ii) How we come to know of ancient people	2	1
B. Early man.		
Use of fire as early as 300,000 B. C. (by 'Peking Man') ; Food gathering man.		1
Old Stone Age : Nature of tools and implements, their uses		1
New Stone Age : (By 8000 B. C.) Evolution of tools and implements. Man—a food producer.		2
The Neo-lithic revolution consisted also of domestication of animals : invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport, beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity. (for 'B' as a whole)	6	4
C. Copper-Bronze Age :		
Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life —classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state.		

	Pages	No. of Lessons
Reasons of the growth of River-Valley Civilisations	4	3
D. The Early Civilisations (3000 B. C.—1500 B. C.)—Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :		
(i) **Mesopotamia** :		
(a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas.		
(b) Fertility of the soil, crops.		
(c) Defence against floods.		
(d) Other occupations.		
(e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.	5	4
(ii) **Egypt** :		
(a) Location and nature of the land ;		
(b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) ;		
(c) Trade ;		
(d) The Pyramids (Examples) ;		
(e) Religious beliefs ;		
(f) Chief occupations. ...	7	6
(iii) **The Indus Valley** :		
(a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ;		
(b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.	7	5
(iv) **China** :		
(a) Valley of Huang Ho and Yang-te-Kiang ;		
(b) China in early times ;		

	Pages	No. of Lessons
(c) Myths (particularly of flood) ...	2	1
(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life. ...	3	2
E. The Iron Age Societies :		
(a) Discovery and use of iron, its impact ;		
(b) Main features of social and economic life ;		
(c) Growth of Kingship. ...	2	2
I. (i) **Babylon :**		
Farming and Commerce, Temples and Priests ; Learning and culture ; The code of Hammurabi—nature of society revealed by the Code.		3
(ii) **Egypt as an Imperial power :**		
Colonies : The power of priests ...		2
(iii) **Iran :**		
Rise of Persia ; Zoroaster ...		2
(iv) **The Jews :**		
Hebrews in Egypt ; Hebrews-exodus under Moses—flight from slavery ... (for 'I' as a whole)	12	2
II. **Greece** (only in broad outlines) :		
An introductory note on the influence of Crete ; The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation.		
Athens and Sparta—their social and political life. Athens Vs. Sparta.		
Cultural greatness of Athens : Literature, Arts, Religion—brief reference to a few eminent persons e.g. Pericles, Sophocles, Socrates, Herodotus.		
Macedon : Alexander—his invasion of India, Fall of the Empire : Roman conquest of Greece.	10	9

	Pages	No. of Lessons
III. Rome : Origin of Rome, Conflict with Carthage. Early Roman Society ; Patricians and Plebeians ; Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus). **Julius Caesar** : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall, Rise of Christianity. ...	8	7
IV. **China** : "Great Shang". Confucius—his teachings, Building the Great Wall. The China Empire.	3	2
V. **India** : (a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires—a brief outline of developments from the Mauryas—to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz. inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia)—their impact upon society and trade. (i) Foreign Travellers — Megasthenes and Fa-Hien — general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education (Taxila and Nalanda) and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).	15	10

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

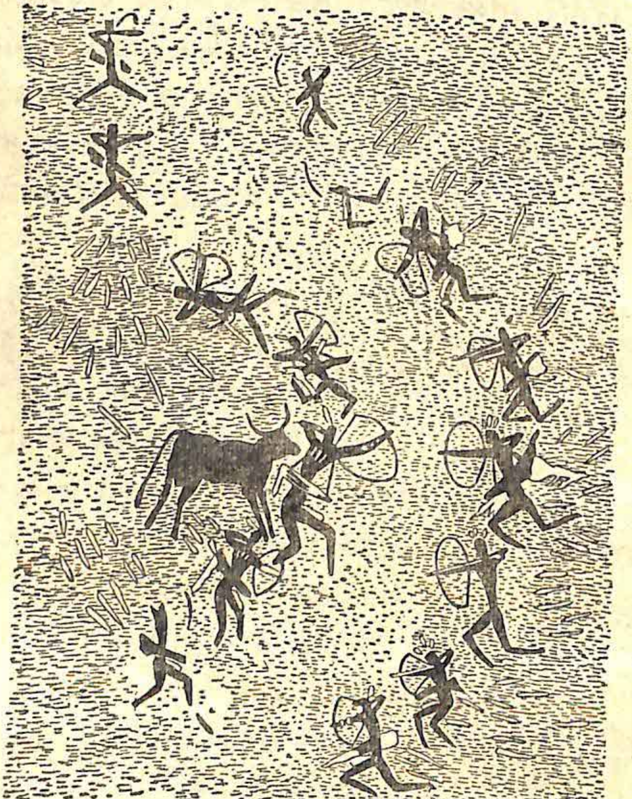
গোড়ার কথা

কেন ইতিহাস পড়ব ঃ ইতিহাস কেন পড়ব, এ প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর না পেলে ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী না হওয়াই স্বাভাবিক। বর্তমানে প্রচলিত ধারায় যে ভাবে তথ্যের সমাবেশ আর ঘটনার বর্ণনা করে ইতিহাস পড়ান হয় তাতে মনে হবে ইতিহাস যেন কিছু অতীত ঘটনার নিরর্থক তালিকা মাত্র। স্বভাবতই আমরা ইতিহাস পাঠের সার্থকতা বুঝতে পারি না। অনেকে মনে করেন কোনক্রমে কতগুলো তথ্য পরীক্ষাপত্রে লিখতে পারলেই ইতিহাসের প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ হল। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণা ঠিক নয়। ইতিহাসের রাজ্যে আমরা একবার প্রবেশ করলে দেখতে পাব ইতিহাসের চেয়ে জীবন্ত আর কিছু নেই।

আজ যে ধরনের সমাজে আমরা বাস করছি তা একদিনে হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই সমাজ গড়ে উঠেছে। আগেকার যুগের নানা সভ্যতার আবির্ভাব ও পতনের কাহিনী পড়লে আশ্চর্য হতে হয়। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে মানুষ ধীরে ধীরে আদিম সমাজ থেকে সভ্য সমাজে প্রবেশ করেছে। এই ভাবেই মানব সমাজের বিকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত সমাজ বা জাতির আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি ইতিহাসের বিষয়। ইতিহাস পাঠ করলে আমরা অতীত দিনের মানুষ ও মানুষের সমাজ সম্পর্কে জানতে পারি, বর্তমানে যে অবস্থায় আমরা আছি তা বুঝতে পারি এবং ভবিষ্যতে কি ধরনের সমাজে মানুষের মঙ্গল হতে পারে তার বিষয়েও চিন্তা করতে পারি। সুতরাং মানব সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝতে হলে ইতিহাস ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। স্বদেশের ও স্বদেশের বাইরে যে সমস্ত দেশ রয়েছে তাদের

ইতিহাস মন দিয়ে পড়লে সমস্ত পৃথিবীর মানব সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে। আমরা বুঝতে পারব, কি ভাবে মানুষ ও মানুষের সমাজে পরিবর্তন ঘটেছে, কেনই বা কোন কোন দেশ এগিয়ে আছে, আর কোন কোন দেশ পিছিয়ে আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রবাদে বলা হয়েছে—'জ্ঞানই শক্তি'। ইতিহাসের চর্চা করলে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

প্রাচীন ইতিহাস জানবার উপায়ঃ হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষের কথা, তাদের জীবনযাত্রার পরিচয় ও তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের



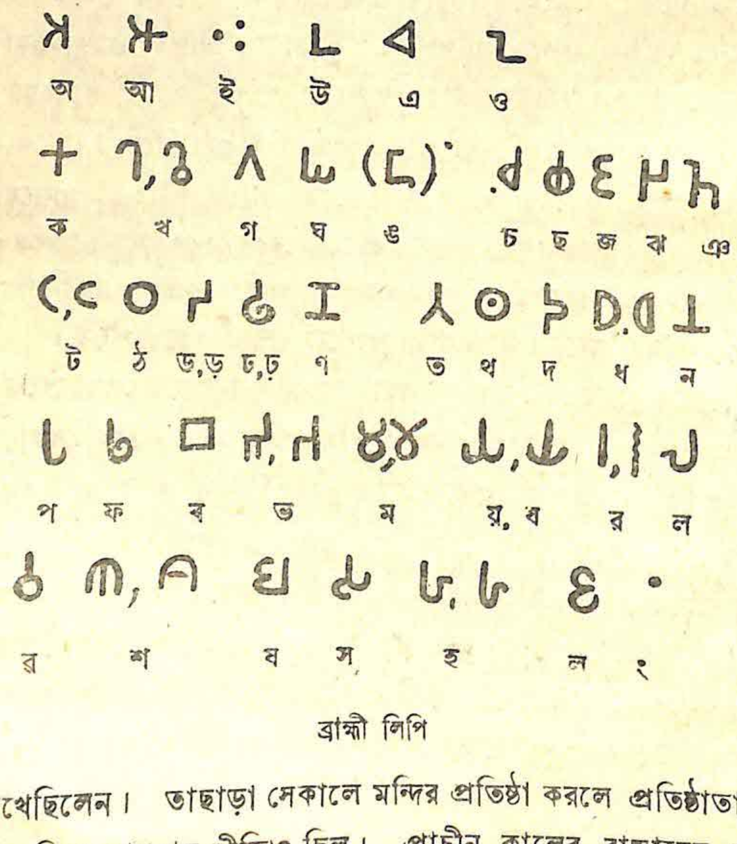
দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত গুহার চিত্র

কাহিনী কেমন করে জানা সম্ভব হয়েছে? এখনকার মত তখনও মানুষ গ্রামে ও শহরে বাস করতো। নানা কারণে এই সব লোকালয়

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কালক্রমে সেইসব জায়গা মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে যায়। পণ্ডিতরা এই সব স্থান খুঁড়ে এক হাজার, দুই হাজার বছর কিংবা তারও আগেকার মানুষের তৈরি অনেক জিনিস পেয়েছেন। এই রকম মাটি খুঁড়ে প্রাচীন জিনিসের সন্ধানকে 'প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য' বলে। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মাটি খুঁড়ে নানা রকম জিনিস পেয়েছেন—শহরের ধ্বংসস্তূপ, সেকালের বাড়িঘর, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, মানুষের হাতিয়ার, ছেলেদের খেলনা, অলঙ্কার ও মাটির পাত্র। মাটির কত নীচে এই সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তা পরীক্ষা করে ঐতিহাসিকরা বলতে পারেন সেগুলি কত প্রাচীন এবং সে যুগের ধ্বংসাবশেষ দেখেও জীবনযাত্রার খানিকটা পরিচয় দিতে পারেন। মহেঞ্জোদড়োর ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে এই ধরনের বহু জিনিস পাওয়া গিয়েছে। কোথাও ঐতিহাসিকরা গুহার গায়ে সেকালের জীবজন্তু কিংবা শিকারের ছবিও উদ্ধার করেছেন। প্রাচীনকালের কবর খুঁড়েও অনেক জিনিস পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন দেশে কবরের মধ্যে মৃতদেহের সাথে জীবিত মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি রেখে দেওয়া হত। মিশর ও চীন দেশে এই ধরনের বহু কবর পাওয়া যায়। এইসব জিনিসপত্র থেকে আমরা তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

প্রাচীন যুগের বেশী খবর পাওয়া যায় সেই সময়কার লেখা থেকে। তখন এখনকার মত ছাপাখানা বা কাগজ ছিল না। তাই সেকালে মানুষ লিখবার জন্য নানাদেশে নানা রকম জিনিস ব্যবহার করত। আমাদের দেশে পুঁথি লেখা হত ভূর্জপত্রে এবং তালের পাতায়। ভূর্জপত্র একপ্রকার গাছের ছাল। প্রাচীন মিশরে 'পেপিরাস' নামক মোটা কাগজের মত একপ্রকার জিনিসের উপর লেখা হত। ব্যাবিলনের লোকেরা নরম মাটির ছোট ছোট টালির উপরে খাগের কলম দিয়ে লিখত। শুকিয়ে গেলে সেগুলি ব্যবহারের উপযোগী হত। সৌভাগ্যের কথা তখনকার দিনের রাজারা এমন সব জিনিসের উপর নিজেদের রাজত্বের কথা লিখতেন যা অনেকদিন

পর্যন্ত টিকে থাকে। আমাদের দেশের এবং আরও অনেক দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কথা পাথরের গায়ে লিপি থেকে পাওয়া যায়। রাজারা নিজেদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও বীরত্বের কথা এইভাবে লিখে রাখতে ভালোবাসতেন। তামার পাতে খোদাই করা দানপত্রে নাম ও বংশপরিচয় লিখে রাখা হত। পাথর কিংবা তামার গায়ে লেখা হত বলে এগুলি অনেকদিন স্থায়ী হত। পাথরের গায়ে লেখাকে শিলালিপি বলে। আবার পাথরে ও ধাতুর ফলকে খোদা লেখাকে উৎকীর্ণ লিপিও বলা হয়। পাথরের গায়ে সব সময় যে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথাই লেখা হত তা নয়। আমাদের দেশে সম্রাট অশোক প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক ধর্ম-উপদেশ ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদাই করে



ব্রাহ্মী লিপি

রেখেছিলেন। তাছাড়া সেকালে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে প্রতিষ্ঠাতার নাম লিখে রাখবার রীতিও ছিল। প্রাচীন কালের রাজাদের মুদ্রা

থেকেও ইতিহাসের কথা জানা যায়। মুদ্রাগুলিতে রাজার নাম, রাজত্বের সময় এবং কোন কোন মুদ্রায় রাজার ছবিও পাওয়া গিয়েছে।


প্রাচীন গ্রীক মুদ্রা


কনিষ্কের মুদ্রা

দু তিন হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন যুগের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলতেন কিংবা লিখতেন, সে সব ভাষা এখন আর বিশেষ প্রচলিত নেই। পণ্ডিতরা অনেক পরিশ্রম করে নানা দেশের প্রাচীন ভাষার ও লুপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। এই সব ভাষা ও লিপি থেকে প্রাচীন ইতিহাস জানবার সুবিধা হয়েছে। অবশ্য সব প্রাচীন লিপি এখনও পড়তে পারা যায় নি।

প্রাচীন যুগের যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে তা থেকেও ঐতিহাসিকরা অনেক কথা জানতে পেরেছেন। আমাদের দেশে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে সেকালের রীতিনীতি ও সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। চীন, মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য, গ্রীস ও অন্যান্য দেশেও এই ধরনের রচনা পাওয়া গিয়েছে।

এখনও প্রাচীন যুগের সব সংবাদ উদ্ধার করা যায়নি। তবে পণ্ডিতদের চেষ্টায় মানুষের জ্ঞান ক্রমেই বাড়ছে। আমাদের দেশে অনেক ধ্বংসস্তূপ এখন পর্যন্ত খুঁড়ে দেখা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় এই সব জায়গা খোঁড়া হলে অনেক নতুন কথা জানা যাবে। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশ সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়।

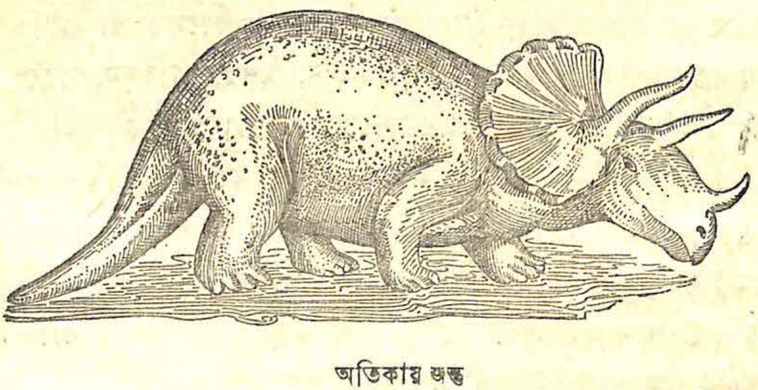
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম যুগের মানুষ

প্রথমে পৃথিবীতে জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না। পৃথিবী ছিল আগুনের চেয়েও গরম একটা জ্বলন্ত পিণ্ড। তারপর ধীরে ধীরে কোটি কোটি বছর পরে সেই গোলাটার বাইরের আবরণ ঠাণ্ডা হল। তারও পরে আরম্ভ হল অবিরাম বৃষ্টি এবং সেই বৃষ্টির জলে পাথরের গুড়া মিশে তৈরি হল মাটি। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল জমে সৃষ্টি হল সাগর। সেই সাগরের জলে প্রথমে জীবনের সঞ্চার হল। সাগরের জলে এক রকমের শেওলা হল। সাগরের কিনারের দিকে গাছপালা গজাতে লাগল। সেই গাছপালা ক্রমশঃ মাটিতেও জন্মাতে লাগল। সাগরের জলে প্রথমে পোকা, পরে অদ্ভুত রকমের সব মাছ দেখা দিল। তারও অনেক পরে আদিম অরণ্যে নানা রকম জীবজন্তুর আবির্ভাব হয়। অনেক জন্তুর চেহারা ছিল অতিকায় ও ভয়ঙ্কর। এক রকম প্রাণী ছিল, তাদের শরীর হাতীর চেয়েও অন্ততঃ চারগুণ বড়, তার

মাটি ও সাগরের সৃষ্টি

গাছপালা ও প্রাণীর আবির্ভাব



অতিকায় জন্তু

উপর জিরাফের মত লম্বা গলা এবং সাপের মত মাথা। আবার কোন কোন প্রাণীর সামনের দিক গণ্ডারের মত দেখতে ছিল, কিন্তু দেহ অন্য জন্তুর মত, মাথায় দুটো শিং। কালক্রমে এই সব অতিকায়

প্রাণ লোপ পেয়েছে। এখন বিভিন্ন দেশের যাতুঘরে এদের কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়।

এই সব জীবজন্তুর পরে এলো স্তন্যপায়ী পশু, মায়ের দুধ খেয়ে যাদের শিশুরা বড় হয়। সর্বশেষে আবির্ভাব হল এক জাতীয় মানুষ, গরিলার বা শিম্পাঞ্জীর ধরনের মুখ, লম্বা লম্বা ধরনের হাত। তারা দেখতে অনেকটা আমাদের মত হলেও ঠিক এখনকার মানুষের মত ছিল না।

পৃথিবীর আদিম অধিবাসী

কতদিন আগে এই ধরনের মানুষের জন্ম হয়েছে তা বলা কঠিন। পণ্ডিতরা অনুমান করেন পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে এই জাতীয় মানুষ পৃথিবীর কোন কোন অংশে বাস করত। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চীন দেশের রাজধানী পিকিং থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌকোতিয়েন নামক ছোট শহরের কাছে পর্বতের গুহায় খননের ফলে পৃথিবীর প্রথম যুগের মানুষের চিহ্ন পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা তাদের 'পিকিং মানুষ' বলে উল্লেখ করেন। পিকিং মানুষের যে সমস্ত অস্থি, দাঁত, মাথার খুলির অংশ ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে তা পরীক্ষা করে জানা যায় এইগুলি পাঁচ লক্ষ থেকে দু লক্ষ বছরের পুরানো। তাই পণ্ডিতরা অনুমান করে বলেন, পিকিং মানুষের অস্তিত্ব তিন লক্ষ বছর ছিল। এই পিকিং মানুষ হাড় ও পাথর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত।

পিকিং মানুষ



পিকিং মানুষ

তারা আগুনের ব্যবহারও জানত। সম্প্রতি চীনের পণ্ডিতরা খনন-কার্য করে পিকিং মানুষ সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পেয়েছেন। জাভাতেও প্রাচীন মানুষের চিহ্ন পাওয়া যায়। ইউরোপে পিকিং বা জাভা মানুষের মত কোন জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি।

অবশ্য প্রথম অবস্থায় মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। জীবজন্তুর মতই সে শিকার করে কাঁচা মাংস খেত, বনে বনে গাছের ফল খুঁজে বেড়াত, মাটি খুঁড়ে নরম নরম গাছের শিকড় খেত। এমনকি খিদে পেলে বানরের মত কচি কচি পাতাও খেত। জীবজন্তুর মত সেকালের মানুষও রাত্রে খোলা জায়গায় ঘুমাত। তারপর সে দেখল গাছের কোটরে বা পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলে বৃষ্টির জলে ভিজতে হয় না, শীতের সময় ঠাণ্ডা কম লাগে। তাই আদিম মানুষ গাছের কোটরে বা গুহায় বাস করতে থাকে। ক্রমশঃ অরণ্যের হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে মানুষ আত্মরক্ষা করতে শিখল। এই সময়ই মানুষ পৃথিবীর সর্বপ্রথম যন্ত্র, পাথরের অস্ত্র, তৈরি করে।

প্রকৃতি-জীবজন্তুর সঙ্গে আদিম মানুষের সংগ্রাম

পাথরের অস্ত্র আবিষ্কার

আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আগুন জ্বালাতে শেখা। অনেক সময় বনে আপনা হতেই আগুনের উৎপত্তি হয়। সেইসব আগুন কিংবা আগ্নেয়গিরি দেখে প্রথম অবস্থায় মানুষ ভয় পেয়েছে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে একথা বুঝতে পেরেছে যে আগুনকে নানারকম কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর ক্রমশঃ মানুষ আগুনে রান্না করতে শিখল, প্রচণ্ড শীত বা হিংস্র প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আগুন জ্বেলে রাখতে লাগল এবং আগুনের সাহায্যে হাতিয়ারও তৈরি করল। সুতরাং আগুনের ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে মানুষের সভ্যতার আরম্ভ হয়েছে বলা চলে। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে আগুন আবিষ্কারের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির এক বিরাট শক্তিকে বশীভূত করতে পেরেছিল। তার ফলে মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জীবজন্তু থেকে মানুষের অস্তিত্ব পৃথক হয়ে ওঠে। মানুষ ক্রমে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হল। আদিম মানুষের মনের উপরেও আগুন আবিষ্কারের প্রভাব পড়ে।

আগুনের ব্যবহার

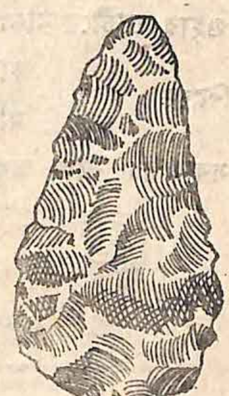
এই অভিজ্ঞতা থেকে সে এক নতুন সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করল। আগুন আবিষ্কারের ফলেই মানুষের পক্ষে পরবর্তীকালে মৃৎপাত্র ও ধাতুর জিনিস নির্মাণ করার কৌশল আবিষ্কার সহজ হয়।

প্রস্তর যুগ

যে যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে কাজ চালাত সে যুগকে প্রস্তর যুগ বলে। মানুষ সভ্য হবার ঠিক পূর্বেকার অবস্থাকে পণ্ডিতরা প্রস্তর যুগ বলেন। প্রস্তর যুগের আরম্ভ অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে, পাঁচ হাজার বছর আগে তার শেষ। প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ হাজার বছর প্রস্তর যুগ চলেছিল। এই

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

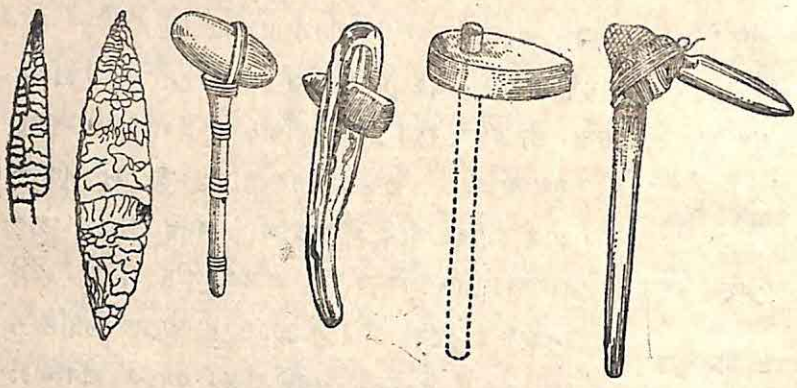
সময়ে মানুষের জীবনে ক্রমান্বয়ে অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রস্তর যুগকে প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে। অবশ্য এই অস্ত্রগুলি ছিল ভাঙ্গা পাথরের সামিল। এই সব অস্ত্র নিয়েই মানুষ দল বেঁধে শিকার করত, বনের ফলমূল সংগ্রহ করত ও মাছ ধরত। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক; শিকারই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। শিকার ও আত্ম-রক্ষার জন্য মানুষ পাথরের যেসব অস্ত্র ব্যবহার করত তা নিতান্তই বিশেষত্বহীন ছিল। এই সময়ে মানুষ অনুভব করল, বাঁচার প্রয়োজনে ও কাজের সুবিধার জন্য তাকে আরও ভাল ও ধারাল অস্ত্র তৈরি করতে হবে। বছরের পর বছর পরীক্ষা করে সেই আদিম মানুষ পাথর ঘসে ধারাল অস্ত্র তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করল। তখন থেকেই সে নানা রকমের নতুন অস্ত্র তৈরি করতে লাগল—ছুরি, কুড়াল, হাতুড়ি, তীরের ফলা ইত্যাদি। এইভাবে নতুন প্রস্তর যুগের আরম্ভ হয়। এই সময় মানুষের হাতে তৈরি



প্রাচীন প্রস্তর যুগের পাথরের অস্ত্র

নতুন প্রস্তর যুগ

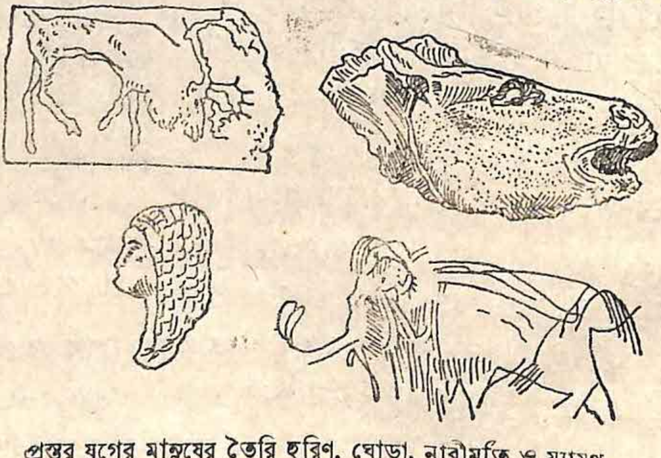
পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পূর্বেকার অপেক্ষা অনেক উন্নত, তার বৈচিত্র্যও অনেক রকম।



নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

অস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে শিল্প রচনার ইচ্ছাও জাগে। সেকালের বর্শার গায়ে তাই আমরা দেখতে পাই পশুর প্রতিকৃতি কিংবা গুহার প্রাচীরে নানা রকমের জীবজন্তুর ছবি। মানুষ হরিণের শিং-এ, হাতীর দাঁতে, পাথরের গায়ে নানাবিধ জীবজন্তু ও মানুষের প্রতিকৃতি রচনা করতে ভালবাসত। যে সব জন্তুর সঙ্গে তখন মানুষের পরিচয় ছিল শিল্পীদের কাজে তার

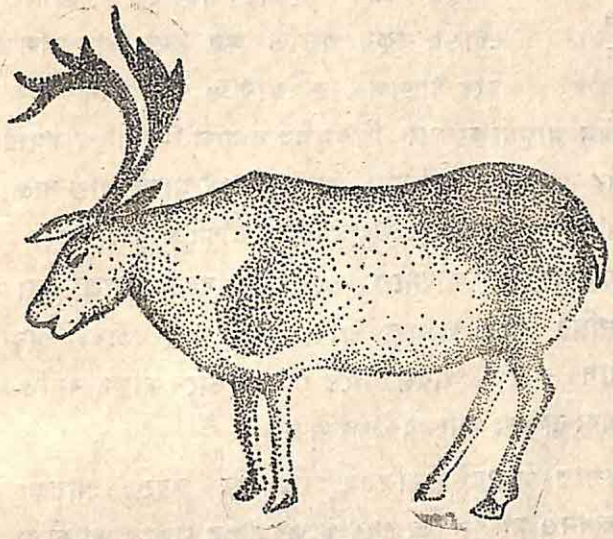
শিল্পকলা



প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি হরিণ, ঘোড়া, নারীমূর্তি ও ম্যামথ

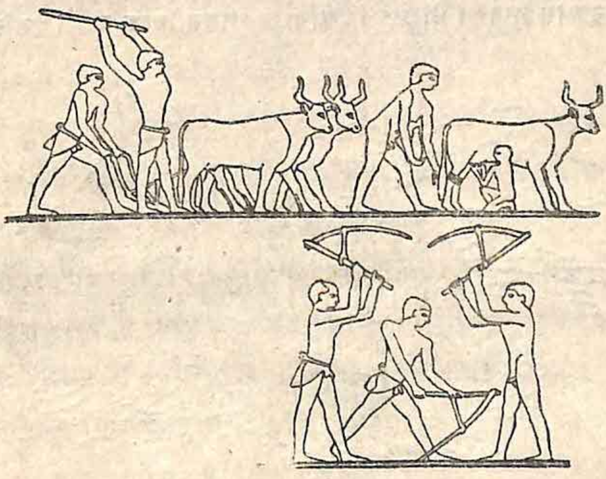
আভাষ পাওয়া যেত। উত্তর স্পেনের আলতামিরার গুহায় যে জীবজন্তুর অপূর্ব চিত্র দেখা যায় তা তো প্রস্তর যুগের মানুষের কীর্তি।

নতুন প্রস্তর যুগের মানুষকে আর খাদ্যের জন্য কেবল শিকারের মাংস কিংবা বনের ফলমূলের উপর নির্ভর করতে হত না। চাষ করে



আলতামিরার গুহার বলগা হরিণ

কি উপায়ে ফসল ফলাতে হয় সে মানুষের জানা হয়ে গিয়েছে।



পশুপালন ও চাষবাস

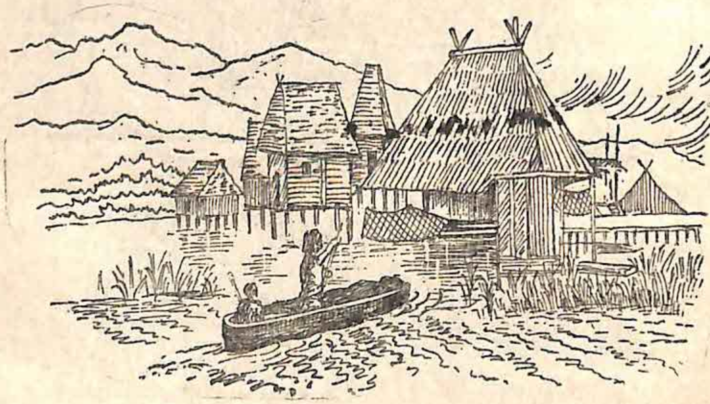
কৃষির মধ্যে গম ও বার্লির চাষ সবচেয়ে প্রাচীন। পরে ধানের চাষ

হয়। মিলেট, যব, রাই ইত্যাদি চাষও হয় এইযুগে। সেই সঙ্গে বনের কতগুলি জন্তুকে পোষ মানিয়ে মানুষ নিজের কাজে লাগাতে আরম্ভ করে। এইভাবে গরু, ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি জন্তু ক্রমে গৃহপালিত পশু হয়ে দাঁড়াল। কৃষিকার্য ও পশুপালন আরম্ভ করার পর আদিম মানুষকে আর শিকারের সন্ধানে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন হত না। তখন থেকেই মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহকের জীবন পরিত্যাগ করে খাদ্য-উৎপাদকের জীবন অবলম্বন করে। এই পরিবর্তন মানুষের জীবনকে একেবারে বদলে দিল বলা যায়। চাষের জমির কাছে থাকলে সুবিধা হয় তাই তারা তার ধারে ধারে বাস করতে আরম্ভ করে। এইভাবে মানুষ বসতি করতে শিখল এবং ক্রমশঃ গ্রামের উৎপত্তি হল।

কৃষিকার্য ও পশু-পালন

তারপরে মানুষ নানারকম ঘরবাড়ি করতে আরম্ভ করে। কখনও কখনও মাটি খুঁড়ে, সেই গর্তের উপর লতাপাতা চাপা দিয়ে বাড়ি তৈরি হত এবং তার চারদিকে গাছের ডালের বেড়া দিয়ে বন্য জন্তু কিংবা শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষার ব্যবস্থা থাকত। আবার পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরি হত।

ঘরবাড়ি



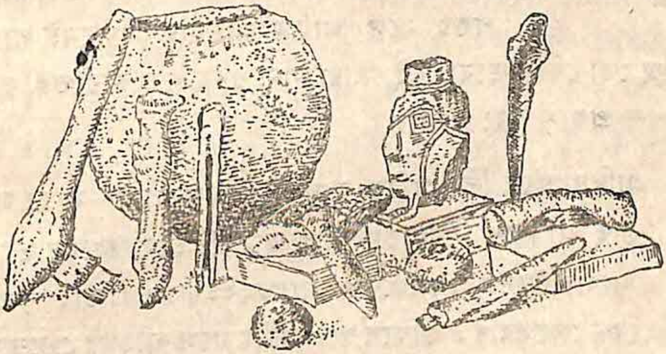
হ্রদের মধ্যে বাড়ি

কখনও হ্রদের মধ্যে খুঁটি পুতে তার উপর বাড়ি তৈরি হত। প্রায়

একশ বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডে একটি হ্রদের জল শুকিয়ে যাওয়ায় এইরকম অনেকগুলি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

কৃষি ও মৃৎশিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গম বা বার্লি বছরে একবার মাত্র উৎপন্ন হয়; তা কৃষিজীবীর সারা বছরের খাদ্য। তার মধ্যে কিছু অংশ আগামী বছরের শস্যরোপনের বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হত। সুতরাং শস্য সঞ্চয় করে রাখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তার জন্য আবার ভাল পাত্রের দরকার। এই অবস্থায় মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করবার জন্য কুমোর চাকাও আবিষ্কার করে। তাই কৃষি ব্যবস্থায় অনিবার্য ফল হল মৃৎশিল্প। সুতরাং নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ মাটির

মৃৎশিল্প



হ্রদ-পল্লীর যন্ত্রপাতি ও বাসন

বাসন তৈরি করতে শেখে। মাটির হাঁড়িতে তারা রান্না করত, হাড়ের বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরত, আস্ত গাছ খুদে নৌকো বানাত, কাঠের হাতা ও কাঠের কলসী ব্যবহার করত।

নতুন প্রস্তর যুগের শেষের দিকে বয়নবিদ্যার আবিষ্কার হয়। প্রাচীন প্রস্তর যুগ হতেই মানুষ জন্তু জানোয়ারের চামড়া পরিষ্কার করে ও শুকিয়ে পরিধেয় হিসেবে ব্যবহার করত এবং শীতের কষ্ট থেকে রক্ষা পেত। নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ তিসি, তুলো ও পশম হতে সুতা তৈরি করে তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনতে আরম্ভ করে। সুতা দিয়ে মাছ ধরবার জালও তারা

বয়ন শিল্প

বুনত। সুতরাং এই যুগের মানুষ সুতা তৈরির যন্ত্র ও তাঁত নির্মাণ করতে শেখে।

এইভাবে এই যুগের মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন করে এবং তা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিজেদের অভাব মেটায়। গ্রামে বসতি স্থাপনের পরে মানুষ সমাজ-জীবন গড়ে তোলে। বিভিন্ন গ্রামের মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, জিনিসপত্রের আদান-প্রদানও চলতে থাকে।

আদিম মানুষ কথা বলতে পারত। কথা বলে তারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করত। আর কথা বলতে পারত বলেই তাদের পক্ষে অনেকে মিলে কাজ করা সম্ভব হয়েছে। পশুর সঙ্গে আদিম মানুষের এখানেই পার্থক্য। পশুর তো কোন ভাষা নেই, তারা নানা রকম শব্দ করে ভয়, রাগ ও আনন্দ প্রকাশ করতে পারে।

ভাষা

আদিম মানুষ দিন-রাত্রির, ঝড়-বৃষ্টির, শীত-গ্রীষ্মের কারণ জানত না। তাই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে, ঝড়-বৃষ্টি হলে তাদের ভয় হত, রাতে আবার চাঁদের আলো দেখে তাদের বিস্ময় হত। তারা বুঝত না হঠাৎ কেন ক্ষেতের শস্য শুকিয়ে যায়, নদীর জলে বাড়িঘর ভেসে যায়; তাই তারা ভাবত নদীর, ক্ষেতের ও আকাশের দেবতা আছেন। তাঁদের খুশী রাখতে পারলে বন্যা, ঝড়, বৃষ্টির ভয় নেই, ক্ষেতের ফসলও নষ্ট হবে না। অর্থাৎ তখন তাদের কাছে যা কিছু আশ্চর্য বা ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে মানুষ তারই পূজা করেছে। এই কারণে অনেক জায়গায় সূর্য পূজা হত। গুহার দেওয়ালে আঁকা ছবি থেকেও সেকালের মানুষের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানা যায়। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত বলে তাদের মৃত আত্মীয়দের কবরে শিকারের অস্ত্র, জলের পাত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রেখে দিত, যেন মৃত্যুর পরে তাদের খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা না হয়। এখনকার সভ্য মানুষ এই যুগের মানুষের বংশধর।

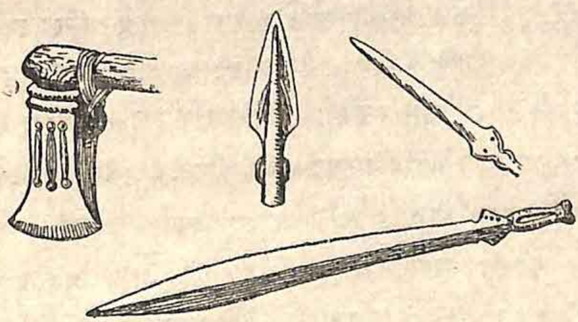
ধর্মবিশ্বাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

প্রস্তর যুগের পর মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করে। উন্নত ধরনের হাতিয়ার তৈরির জন্য শক্ত পাথরের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ ক্রমশঃ তামার আবিষ্কার করল। তার পরে এলো ব্রোঞ্জ। তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়। তামার চেয়ে ব্রোঞ্জ আরো অনেক শক্ত। তামা ও দস্তা মিশিয়ে পিতল উৎপন্ন হয়। এর বহু পরে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ধাতুর মধ্যে সোনার ব্যবহার সবচেয়ে প্রাচীন। সোনার সাথে নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের যে পরিচয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন করত বলে এই যুগকে 'তাম্র ব্রোঞ্জ-যুগ' বলা হয়। মেসোপটেমিয়া, মিশর ও ভারতবর্ষে এই যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ধাতু গলাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারায় এবং নানা জিনিস তৈরি করতে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যাপক প্রয়োগ করতে সক্ষম হওয়ায় এই যুগের মানুষের ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে

তামা ও ব্রোঞ্জ আবিষ্কার



ব্রোঞ্জের হাতিয়ার

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর সর্বত্র এক সঙ্গে এক যুগ শেষ হয়ে অন্য যুগ আরম্ভ হয়েছে, একথা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে।

এক দেশে যখন ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে, অন্য দেশে তখনও হয়তো প্রস্তর যুগ শেষ হয়নি।

ধাতুনির্মিত কুঠার, তলোয়ার, তীরের ফলা, বর্শা, লাঙলের ফলা, ইত্যাদি মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে। মানুষ কাঠ থেকেও নানারকম জিনিস তৈরি করতে আরম্ভ করে। কাঠের লাঙল ও ধাতুর তৈরি লাঙলের ফাল দিয়ে তারা সহজেই চাষের কাজ করতে পারে।

বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন

গৃহপালিত পশুকেও কৃষি ও অন্যান্য কাজে লাগানো হয়। তারা কাঠের নৌকাও বানাতে শেখে। নিজেদের বাসের জন্য বড় কাঠের বাড়িও বানানো আরম্ভ হয়। উন্নত ধরনের কুমোরের চাকার ও তাঁতের প্রচলন হওয়ায় মানুষ অনেক সহজে বাসনপত্র তৈরি করতে পারে, কাপড় বোনাও সহজ হয়। তারা ধাতুর পাত্রে মাংস ও শবজি রান্না করতে শেখে। এর ফলে খাওয়া-দাওয়ারও পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে।

সাগরের জলে যেমন প্রথম জীবনের সঞ্চার হয়, তেমনি সভ্যতার আরম্ভ হয় বড় বড় নদীর তীরে। নদীর দুই তীরের জমিতে পলিমাটি জমে বলে ভাল ফসল ফলে, ক্ষেতের সেচের জন্য জলের অভাব হয় না। তখনও ভাল রাস্তাঘাট হয়নি, তাই নদীর পথে নৌকায় যাতায়াত

নদীর তীরে সভ্যতার বিকাশ

করাই সুবিধাজনক ছিল। নদীর ধারে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠতে লাগল। তখন নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল এমন মানুষেরা এক একটা দল গঠন করে এই সব গ্রামে বাস করত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ও চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারের উর্বর স্থানে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর ধারে নতুন সমাজ দেখা দিতে লাগল। ক্রমশঃ ছোট গ্রাম বড় হল, বড় গ্রাম শহরে পরিণত হল। এইভাবে প্রথম সভ্যসমাজের উৎপত্তি হয়। যে অঞ্চল চাষের পক্ষে উপযোগী ছিল সেখানে কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন। এখানে তারা খাদ্যশস্য, তরি-তরকারী, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করতে আরম্ভ করে। জলসেচনের ব্যবস্থা করেও তারা ফসল ফলায়।

অন্যদিকে যে জায়গা কৃষিকাজের পক্ষে ততটা উপযোগী ছিল না সেখানে মানুষ পশুপালন আরম্ভ করে। বিশেষ করে যে সমস্ত জাতি বা দল পূর্বে শিকারের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা দেখতে পেল পশুপালন অনেক লাভজনক। এই সব পশুপালক জাতি মাংস, দুধ, চামড়া, পশম ইত্যাদি জিনিস তৈরি করতে থাকে। এরাও সুবিধামত জায়গায় স্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। কাজেই এক একটি জাতি বা দল হয় কৃষিকাজ নতুবা পশুপালন করে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। একে ইতিহাসের প্রথম সামাজিক শ্রম-বিভাগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পশুপালনের ও কৃষির উন্নতির প্রয়োজনে পশুপালক ও কৃষিজীবী জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই তারা কাছাকাছি বাস করত; নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতার ও উৎপাদনে উপযোগী যন্ত্রপাতির লেনদেন করত। তার ফলে কৃষিতে ও পশুপালনে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কৃষিজীবী ও পশুপালক

কৃষিতে লাঙলের ও পশুর ব্যবহার এবং পশুপালন দৈহিক শক্তি ছাড়া সম্ভব ছিল না। এইসব পরিশ্রমের কাজ পুরুষেরা করতে সক্ষম। এক সময় ছিল যখন সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মেয়েদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। মেয়েরা সাধারণতঃ ঘরের কাজেই আবদ্ধ থাকে। পুরুষেরা পরিবারের প্রধান হয় এবং জাতি বা দলে তারাই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এইভাবে সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

সমাজে পুরুষদের কর্তৃত্ব

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষের আর আগের মত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকার দরকার ছিল না। জিনিসপত্র তৈরির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের পক্ষে কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। চাষের ফসল ও পশু বাড়তি হলে নষ্ট হবার ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম একটা জাতি বা দল তাদের বাড়তি জিনিসপত্র অন্য একটা জাতির বাড়তি জিনিসের সঙ্গে বিনিময় করতে

বিনিময় প্রথার সৃষ্টি

লাগল। কোন জাতি হয়তো চামড়ার বদলে কিছু ধান নিয়ে নিল। এমনি করে বিনিময় প্রথার সূত্রপাত হল। এই সময়ে সমাজে শ্রমবিভাগ দেখা দেয়। সমাজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করার ভার এক এক দল নিয়ে নেয়। যেমন চাষী, পশুপালক, তাঁতী, কুমোর, কামার, ছুতোর প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তৈরি করতে আরম্ভ করে এবং তারা নিজের কাজে খুব পটু হয়ে পড়ে। যে যা তৈরি করত, সেটা হত তার নিজেরই ব্যক্তিগত জিনিস। এইভাবে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জিনিসপত্রের বিনিময় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে ধান বোনে তার হয়তো কাপড় কিংবা তাঁতীর খাবারের দরকার। চাষী ধান দিয়ে কাপড়, আর তাঁতী কাপড় দিয়ে চাল সংগ্রহ করত। প্রথমে কেনা-বেচা চলত জিনিস বদল করে। তারপর মুদ্রা বা টাকার প্রচলন হয়। তারা বুঝতে পারল, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হয়ে জিনিসপত্র কেনা-বেচা করলে সুবিধা হয়। তাই সৃষ্টি হল বাজারের। বাজারে বিক্রীর জন্য বিভিন্ন জিনিস উৎপন্ন হওয়ায় পণ্য উৎপাদন প্রথার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে। তার ফলে এই সব বাজারকে কেন্দ্র করে বসতি হয়। এখানে কারিগররা বাস করতে থাকে। এইসব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্রই আস্তে আস্তে শহরে পরিণত হয়। সাধারণতঃ স্থায়ী মনুষ্য বসতি, ধর্মস্থান, বিশুদ্ধ জলের প্রস্রবণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংযোগস্থল ইত্যাদি কেন্দ্রেই সেকালের শহর গড়ে উঠেছিল।

শ্রম বিভাগ

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার

বাজারের সৃষ্টি

শহরের উৎপত্তি

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এক একটা জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচিত করে তার নির্দেশে চলতে থাকে। নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে বিভিন্ন জাতি পরস্পর সংঘর্ষে ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শক্তিশালী জাতি

দুর্বল জাতিগুলোর উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে থাকে। অনেক সময় ছোট ছোট জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে একটি বড় জাতি তৈরি হল। যুদ্ধে যারা বন্দী হত প্রথমে তাদের মেরে ফেলা হত। পরে তারা দেখল যে, এইসব বন্দীদের যদি চাষের বা অন্যান্য কাজে লাগানো যায় তাহলে অনেক সুবিধা হয়। এর ফলে যুদ্ধে যারা বন্দী হত তাদের একটা জাতির ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হত।

সমাজে শ্রেণীভেদ

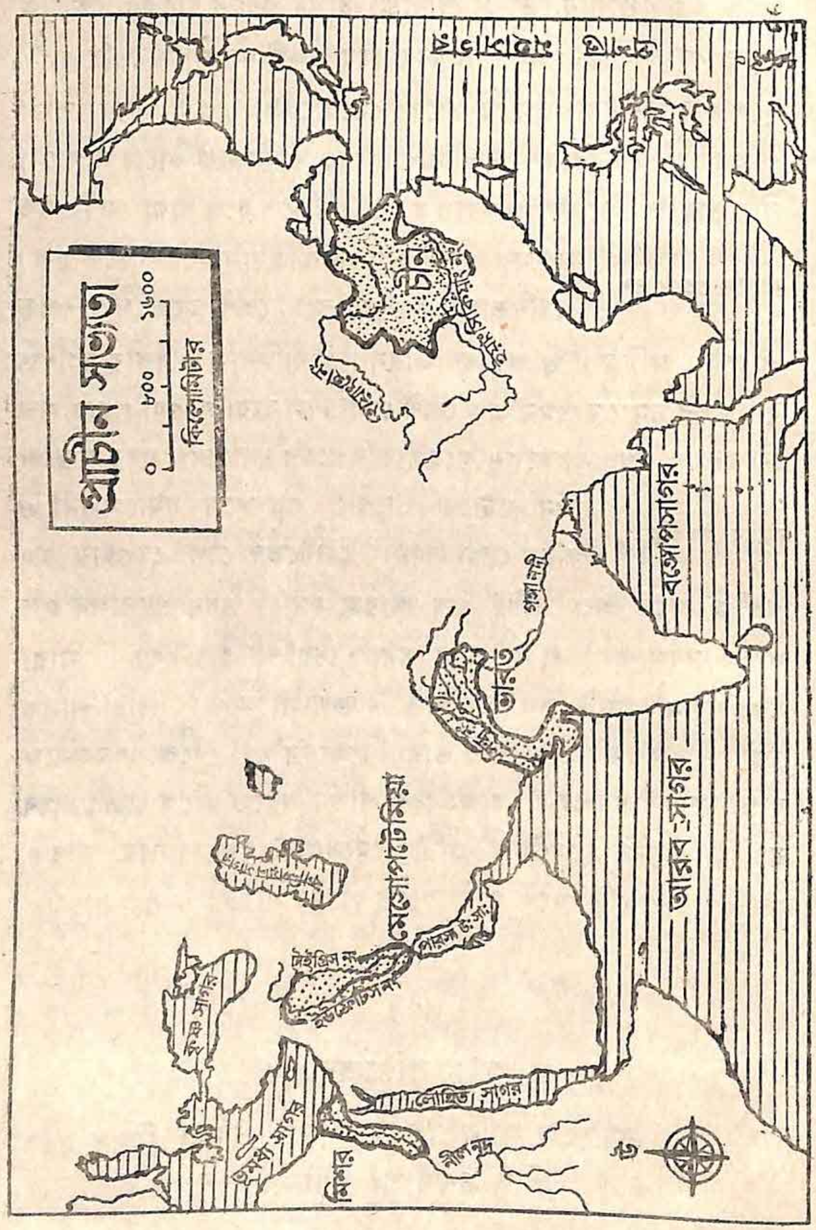
এমনিভাবে সমাজে দুটো শ্রেণী হয়ে গেল—প্রভু ও দাস। জমিজমা ও অন্যান্য জিনিসপত্রে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপিত হবার পর সমাজে এমন এক শ্রেণী দেখা দিল যারা খাওয়া পরার জন্য নিজেরা পরিশ্রম না করেও অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগ করে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে। এর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র দেখা দিল। শ্রেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। তখন প্রয়োজন হল শাসন ব্যবস্থার। তা না হলে সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। যারা সম্পত্তিবান তারাই ছিল সমাজের শক্তিশালী অংশ। তারা শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয়। আর তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা মনোনীত করে। রাজা দেশ শাসন করতে থাকে। এইভাবে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রথম যুগের রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সভ্য সমাজের আবির্ভাব : মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও চীন

এশিয়া ও আফ্রিকার বড় বড় নদীর ধারে কৃষি প্রধান গ্রাম ও শহরগুলোতে প্রথম সভ্যসমাজ গড়ে ওঠে। এই সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল মেসোপটেমিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর


প্রাচীন সভ্যতা
০ ৮০০ ১৬০০
কিলোমিটার
প্রশান্ত মহাসাগর
চীন
বঙ্গোপসাগর
গঙ্গানদী
ভারত
আরব সাগর
মেসোপটেমিয়া
টাইগ্রিস নদী
ইউফ্রেটিস নদী
পারস্য উপসাগর
কৃষ্ণ সাগর
ভূমধ্য সাগর
লোহিত সাগর
নীলনদ
মিশর
উ

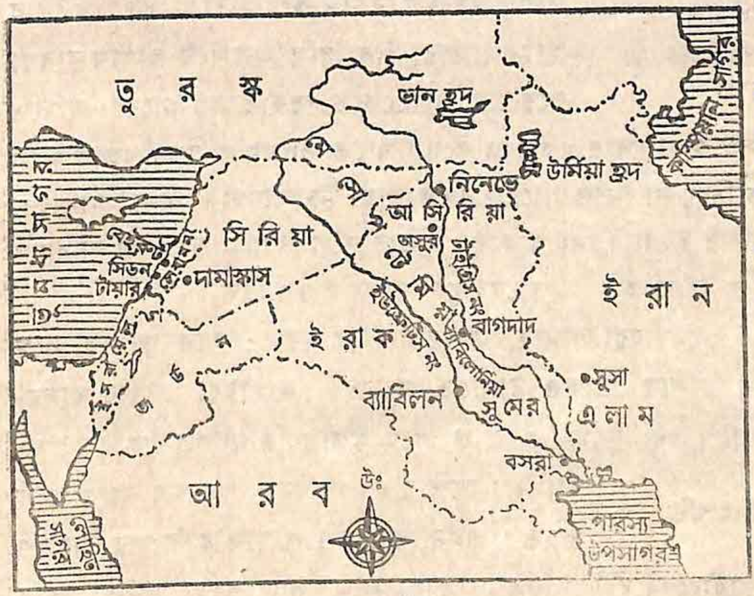
ধারে, মিশরে নীল নদের দুই তীরে, ভারতবর্ষে সিন্ধু নদীর ধারে এবং চীন দেশে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে। এর মধ্যে মেসোপটেমিয়ার জনপদগুলোই সবচেয়ে প্রাচীন। এখানেই প্রথম সভ্য সমাজের আবির্ভাব হয়।

॥ এক ॥

মেসোপটেমিয়া

আরব মরুভূমির উত্তরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে মেসোপটেমিয়া বলে। মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ দুই নদীর মাঝের জায়গা। এর পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সুমের, মধ্য ভাগে ব্যাবিলন এবং উত্তরভাগে অসুর বা আসিরীয় দেশ; উত্তরে ও পূর্বে পর্বতমালা। এই দুই নদী পারস্য উপসাগরে

ভৌগোলিক অবস্থান



মেসোপটেমিয়া

এসে মিলিত হয়েছে। নদী দুটি মাঝে মাঝে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করত এবং নতুন পলিমাটি পড়ায় এই অঞ্চল উর্বর হয়ে উঠত

গরমের সময় পাহাড়ে বরফ গলে নদীতে বন্যা হত। বন্যার জল সরে গেলে পলিমাটির আস্তরণ পড়ত। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার জমি ছিল বেশী উর্বর। এ অঞ্চলে বৃষ্টি কম হত, তাহলেও এ দুটি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে ও খাল কেটে জল সেচনের ভাল ব্যবস্থা করা হত। এর ফলে জমি খুব উর্বর থাকত। এখানকার লোকেরা অনেকদিন থেকেই এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

সুমের সভ্যতার বিকাশ

সুমের পারস্য উপসাগরের খুব কাছে। তখন এখানে চারিদিকে অতিরিক্ত জল ছিল। নদীর প্লাবনে ও বৃষ্টির জলে সমগ্র অঞ্চল প্রায়ই প্লাবিত হত। জল বাড়লে সুমেরীয়দের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিত যে তাদের দেশ হয়তো এক সময় জলাভূমিতে পরিণত হবে, আবার জল সরে গেলে বছরের একটা সময় জলের টানাটানি পড়ত। এই অবস্থায় তারা অনেক বাঁধ তৈরি করে জল আটকাবার ব্যবস্থা করে। দুই নদীর মোহানার কাছে জলাভূমির জল নিকাশ করে তারা চাষের জমি তৈরি করে। তারা বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করে এবং খাল কেটে দরকার মত চাষের জমিতে সেই জল দেবারও ব্যবস্থা করে। যাতে তাদের বাড়িঘর বন্যার জলে ভাসিয়ে না নিতে পারে, সেজন্য তারা উঁচু জায়গায় গ্রাম, বাড়িঘর, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে। তার ফলে এখানে খুব বেশী পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হত। তাদের গৃহপালিত পশুও ছিল।

বাঁধ নির্মাণ ও জলসেচনের ব্যবস্থা

সুমেরীয়রা তামার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত; আর তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জও বানাতে জানত। কামাররা তামার বাসন-কোসণ এবং তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করত। তাঁতীরা সুতোর কাপড় বুনত, পশমের বস্ত্রও তৈরি করত। এমন কি সোনা ও হাতীর দাঁতের কাজেও সুমেরীয়দের দক্ষতা ছিল। তারা অনেকগুলি শহর নির্মাণ করায় সেখানেও নানা ধরনের কারিগরের সমাবেশ হয়। পথ-ঘাট তৈরি হওয়ায় বিভিন্ন গ্রামের ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

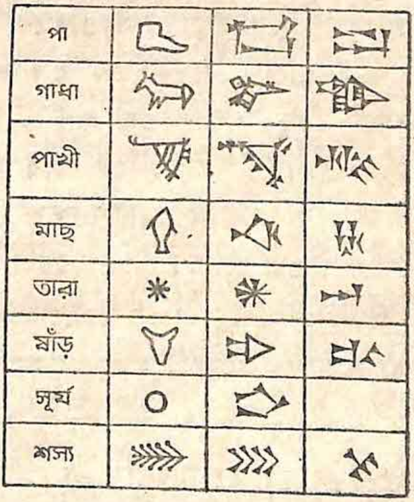
বিভিন্ন বৃত্তি

তারা ভারী জিনিস বহন করার জন্য গাধায় টানা চাকাওয়ালা গাড়ীও আবিষ্কার করে। এর আগে আর কোন জাতি গাড়ীর চাকা তৈরি করতে জানত না। সুমেরীয় চিত্রাঙ্কনে চাকার গাড়ীর একটি নমুনা পাওয়া যায়। হিসেব লিখে রাখার ও নানা প্রকার ওজনের পরিমাণ নির্ধারিত করবার পদ্ধতিও তারা আবিষ্কার করে।

তখন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে আরব ও পূর্ব-আফ্রিকার কোনও কোনও দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। সুমেরীয়রা তাদের বাড়তি শস্যের বিনিময়ে বিদেশ থেকে তামা কিনে আনত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নতিও হয়।

লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কার

সুমেরীয়রা লিখন-পদ্ধতিও আবিষ্কার করে। এই লিপিকে ইংরেজীতে কিউনিফর্ম (Cuneiform) বলে। বাংলায় কীলকলিপি বা বাণমুখী লিপি বলা চলে। এক সময়ে এই লিপি প্রায় সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত ছিল। নরম মাটির টালিতে খাগের কলম দিয়ে লেখা বলে এই লিপিকে কীলকলিপি বলা হয়। এই মাটির টালি আগুনে পোড়ালে বা রোদে শুকালে খুব শক্ত হয়, সহজে নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে না। সুমের, ব্যাবিলন ও আসিরীয়ার লোকেরা মাটির টালিতে লিখত। এখানকার ধ্বংসাবশেষ থেকে এই ধরনের অনেক টালি পাওয়া গিয়েছে। এই টালিগুলোতে রাজ্য-শাসনের কথা, নানাপ্রকার দলিল, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বহু বিষয়ের কথা আছে।



কীলক-লিপির ক্রমবিকাশ

খুব উঁচু বাড়ি ও মন্দিরের যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সুমেরীয়দের ধর্মীয় জীবনের কথা জানা যায়। তাদের ধর্মীয় সাহিত্যের প্রভাব অন্যদের উপরও পড়ে। সুমের অঞ্চলের প্রতি শহরেই দেবতার মন্দির ছিল। তারা বায়ু, জল ও আলোর দেবতার উপাসনা করত; আকাশের গ্রহ ও নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করত। তারা অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেবতার পূজো করত। বিশাল উঁচু মন্দির ছিল সমচতুর্ভুজ বিশিষ্ট; দেখতে অনেকটা ছাদের আকৃতিযুক্ত পিরামিডের মত। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই একটা স্থানে সুমেরীয়রা স্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। দেব মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদ থেকেই কালক্রমে রাজার শাসনকার্য পরিচালনার কেন্দ্রের আবির্ভাব হয়। মন্দিরেই ছিল স্থানীয় রাজকীয় কাগজ পত্রের দপ্তরখানা। এই মন্দিরের ভাণ্ডার ঘরে শস্য, মন্দিরের জমি থেকে আদায় করা খাজনা ও ভক্তদের দানসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা হত। এখান থেকে রাজা জনসাধারণের প্রয়োজনে শস্য ধার নিতেন। অন্য লোকেরাও তাদের প্রয়োজন হলে মন্দিরের ভাণ্ডার থেকে শস্য ধার নিত।

ধর্ম ও মন্দির

গিলগামেস নামক এক রাজার কাহিনীতেও সেকালের জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর কাহিনী নিয়ে যে কবিতা রচিত হয় তার কিছু অংশ আসিরীয়দের রাজা অসুরবাণীপালের বিরাট গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই রচনা গিলগামেসের বীররসাত্মক কাব্য (Epic of Gilgamesh) নামে পরিচিত। এই রচনার প্রভাব আশেপাশের কয়েকটি অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।

গিলগামেসের কাব্য

সুমেরীয় সমাজে স্থাপত্য ও শিল্পকলার কথাও আমাদের কিছু জানা আছে। তারা বিশাল উঁচু বাড়ি ও মন্দির ইট দিয়ে তৈরি করত। তখনকার ইট বেশ বড় আকারের ছিল। সমতলভূমিতে পাথর কম পাওয়া যেত। তাহলেও পাথরের তৈরি ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পাথরের তৈরি বন্য পশু এবং কদাকার জন্তু ও মানুষের

মাথার আকৃতি সহ ষাঁড় সেকালের শিল্পরীতির পরিচয় বহন করছে। সুমেরীয়রা পাথরের নানা রকম কাজে খুব পটু ছিল। নরম মাটির প্রশস্ত ফলকের উপর ছাপ দেওয়া যায় এমন সুন্দর মোহর তারা পাথর কেটে তৈরি করতে জানত। একে এক ধরনের মুদ্রাঙ্কন বলা যায়। একটি মোহরের উপর একজন পুরুষ ও মহিলার মূর্তি অঙ্কিত আছে, সম্ভবতঃ কোন দেব ও দেবী। ছবি ও কারুকার্যখচিত জিনিস দেখে সেকালের শিল্পীদের দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

শিল্পকলা

সুমেরীয়রা অনেকগুলো শহর নির্মাণ করে। তাদের একটি বিখ্যাত শহরের নাম ছিল উর। উর শহরে একটি সুন্দর সোনার ছোরা পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেক শহরে এক একটি দেবতা এবং একজন করে রাজা ছিল। সুমেরীয়রা কিছু আইনও তৈরি করে। শহরগুলোর মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সুমেরীয়রা যুদ্ধপ্রিয় ছিল। যুদ্ধের সময় রাজারা রথে চড়ে সৈন্যদের চালনা করত। সৈন্যদের প্রধান অস্ত্র ছিল বর্শা ও কুঠার। তারা চামড়া অথবা তামার শিরস্ত্রান ব্যবহার করত, ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করত। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শহরগুলো প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হত। তার চারিদিকে থাকত ক্ষেত-খামার। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের উর শহরের একতলা-দোতলা বাড়ী দেখে ও অন্যান্য নিদর্শন দেখে বোঝা যায় এখানকার সভ্যতা কত সমৃদ্ধ ছিল। লাগাস, কিশ ও উর অঞ্চলে খননকার্য করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা সুমের সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। সুমের অঞ্চলে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে চর্চা হত। এখানে গণনা পদ্ধতির উন্নতি হয়েছিল। সুমেরীয়রা সেজন্য ঋতু পরিবর্তন ও তার সময় নির্ণয় করতে জানত।

শহর নির্মাণ

যুদ্ধ ও রাজনীতি

সুমের অঞ্চলের নিকটে আরব দেশ হতে আগত আক্কাদ জাতির বাস ছিল। সুমের জাতির সাথে আক্কাদ জাতির বিরোধ দীর্ঘকাল চলে। তাছাড়া সুমের ও আক্কাদের ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যের মধ্যেও

গোলযোগ দেখা দেয়। এই সব কারণে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে ব্যাবিলন রাজ্য সুমের ও আক্কাদ অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে। সুমেরীয় শহরগুলোর পতন ঘটলেও এই অঞ্চলে সুমেরীয়দের ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব অনেককাল পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

সুমের সভ্যতার পতন

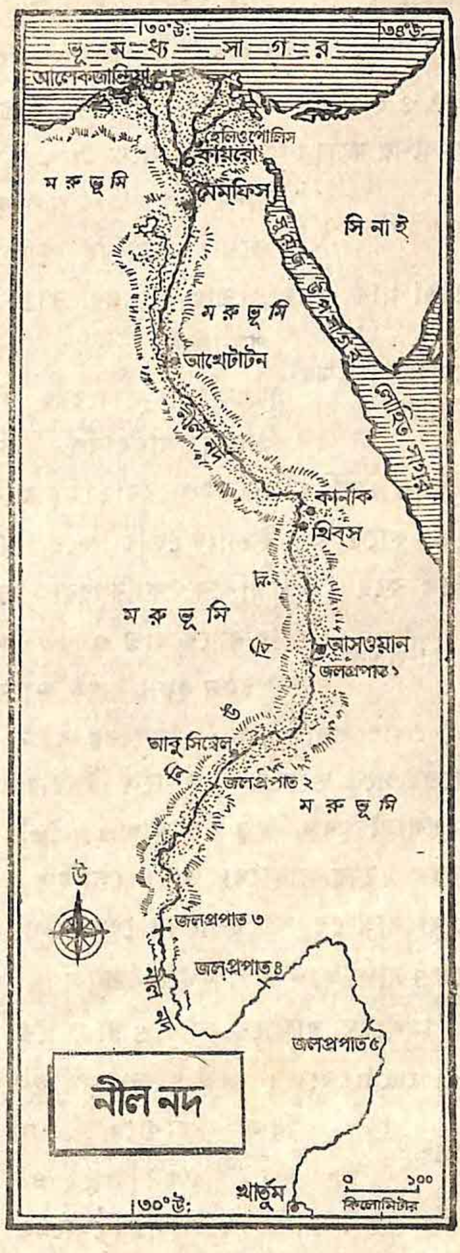
॥ দুই ॥

মিশর

মিশর আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি দেশ। এর পূর্বে লোহিত সাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি। মিশরে এত কম বৃষ্টি হয় যে তার উপর নির্ভর করে চাষ করা চলে না। কিন্তু অ্যাবিসিনিয়ার পর্বতে প্রচুর বৃষ্টি হয়; সেই জল নীল নদে গিয়ে পড়ে। তার ফলে প্রতি বছর নীল নদে বন্যা হয় এবং মাটি নরম ও উর্বর থাকে। নীল নদে বন্যা না হলে সমস্ত দেশ মরুভূমি হয়ে যেত। এই জন্য মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয়। এই জমির টানে প্রাচীন মিশরীয়রা নীলনদের দুই তীরে বাসা বাঁধে। কিন্তু বন্যার জল ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ ও বিলি করতে না পারলে চাষবাস করা কষ্টকর। আর এই কাজ করা তো একজন কিংবা দুই জনের সাধ্য নয়। তাই বহু লোক মিলে বাঁধ দিয়ে জল আটকাবার ব্যবস্থা করে, জল সঞ্চয় করে, আর খাল কেটে চাষের জমিতে জল দেয়। তারা উঁচু জমিতে বাড়ি, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে। জীবন ধারণের জন্য এই সব ব্যবস্থা করতে গিয়ে মিশরীয়রা সভ্য সমাজ গড়ে তোলে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে। মিলে মিশে কাজ করতে হলে একজন কর্তা ব্যক্তির কথা মেনে চলতে হয়। এইভাবে একজন রাজার অধীনে একটি জনপদ

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু

গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জনপদে একজন করে রাজা ছিল, রাজার ছিল রাজধানী, আর রাজধানীতে ছিল জনপদের অভিভাবক দেবতার মন্দির। এমনি করে মিশরে খণ্ড খণ্ড প্রায় চল্লিশটি ছোট রাজ্য দেখা দিল। ক্রমে ক্রমে লোকে বুঝতে পারল যে, প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ও নদীর জলকে ঠিকমত চাষের কাজে লাগাতে হলে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। প্রথমে উত্তর ও দক্ষিণে দুটো বড় মিলিত রাজ্য গড়ে ওঠে। তারপরে সেই দুই রাজ্য যুক্ত হয়ে সমস্ত দেশ এক রাজ্যে পরিণত হল এবং মিশরে এক রাজার আধিপত্য স্থাপিত হল। এইভাবে মিশর রাজনৈতিক ক্ষমতায় ও সম্পদে বড় হয়ে উঠল।



চাষের উন্নতি করে মিশরীয়রা নানা রকম শস্য উৎপন্ন করে। নীল নদের দুই তীরে গম ও বার্লি বেশ ভালই হত। গৃহপালিত পশুকেও তারা কাজে লাগায়। গরু ও ছাগলের মাংস এবং দুধ তারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত।

কৃষিকাজ ও পশুপালন

প্লাবনের ফলে চাষের জমি মাঝে মাঝে পলিমাটিতে ঢাকা পড়ত বলে মিশরীয়রা জমি জরিপ করবার পদ্ধতিও আবিষ্কার করে। মিশরের কারিগররাও খুব কুশলী ছিল। তারা মাটি, তামা, ব্রোঞ্জ, পাথর, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করত। মণিকাররা অলঙ্কার, কুমোরেরা বাসনপত্র, ছুতোর মিস্ত্রীরা কাঠের আসবাবপত্র, নৌকো, স্থপতিরা পাথরের মূর্তি ও সমাধি মন্দির, চর্মকারেরা চামড়ার জিনিস, কামারেরা বাটালি, ছুঁচ, কাস্তে, বর্শা ইত্যাদি তৈরি করে মিশরের অর্থনৈতিক জীবন উন্নত করে। প্রথমদিকে কারিগররা তাদের তৈরি জিনিসপত্রের বিনিময়ে খাদ্য ও পশু কিনত। আরও পরে মুদ্রার প্রচলন হয়। এই ভাবে মিশরে কৃষির ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু নীল নদের ধারেই গড়ে ওঠেনি। সেকালে মিশরীয়রা সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজও তৈরি করে। তার সাহায্যে তারা লোহিত ও ভূমধ্য সাগরের আশেপাশের দেশগুলোর সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

জমি জরিপ

নানাপ্রকার জিনিস উৎপাদন

ব্যবসা-বাণিজ্য



থাটমোস

মিশরের রাজাকে ফ্যারাও বা ফ্যারো (Pharaoh) বলে। এই শব্দের অর্থ হল 'যিনি প্রাসাদে বাস করেন'। তখন মিশরে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, সাধারণ লোকের রাজার নাম উচ্চারণ করা উচিত নয়। সেইজন্য দেশের রাজাকে এই

ফ্যারাও

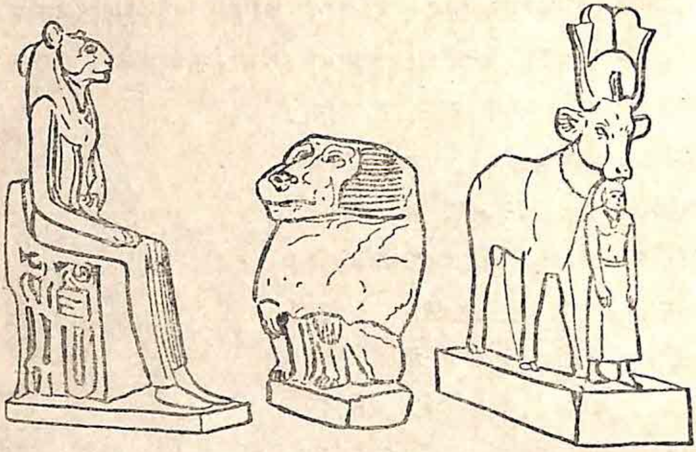
ভাবে উল্লেখ করা হত। মিশরে রাজাকে দেবতার পুত্র ও দেশের সর্বেসর্বা মালিক বলে মনে করা হত।

মিশরীয়রা অনেক দেব-দেবী পূজো করত। এই কারণে বহু মন্দির তারা নির্মাণ করে। দেবতাদের মধ্যে একজনের নাম রা, তিনি সূর্যের দেবতা। দক্ষিণ মিশরে তাঁকে আবার অ্যামনও বলা হত। আরও একজন দেবতা ছিলেন, তাঁর নাম ওসাইরিস। ওসাইরিস আবার আমাদের যমরাজের মত মৃত লোকেরও দেবতা। তাছাড়া মিশরীয়রা কুমীর, বেড়াল, ষাঁড়, ভেড়া প্রভৃতি কোন কোন জীব-জন্তুকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মা দেহে বাস করে। সেইজন্য মৃত দেহ অবিকৃত রাখবার চেষ্টা হত। মৃত্যুর পরেই মানুষের দেহকে পরিষ্কার করে নানা রকম ওষুধ মাখিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দেওয়া হত। এই দেহকে ম্যমি বলে। যে উপায়ে মৃত দেহকে অবিকৃত রাখা হত তা এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মিশরের পিরামিডগুলোতে এইরকম অনেক ম্যমি পাওয়া গিয়েছে। নানা দেশের যাদুঘরে ম্যমি দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতার যাদুঘরেও মিশরের ম্যমি আছে। কাচের 'কেসের' মধ্যে শোয়ানো ম্যমিকে লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যাবে কি রকম করে ওষুধ মাখিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হত।


ওসাইরিস

ম্যমির কথা বলতে গেলেই পিরামিডের কথা বলতে হয়। পিরামিডগুলো প্রকৃতপক্ষে ফ্যারাওদের কবর। পিরামিডের ভেতর একটি ঘরে মৃতদেহ যত্ন করে রাখা হত এবং তার সাথে মৃতের

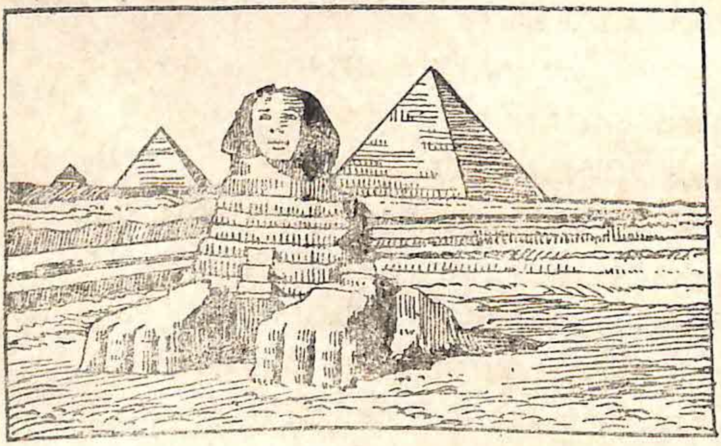
ব্যবহারের অনেক জিনিস, যেমন, আসবাবপত্র, জামাকাপড়, গন্ধদ্রব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি সাজিয়ে রাখা হত। নানা রকম দামী জিনিসপত্র



মিশরের দেবদেবী

থাকত বলে কবরের মধ্যে ঢুকবার দরজা এমন কৌশলে করা হত যাতে সহজে প্রবেশ করা না যায়। তবুও অনেক কবর দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সবচেয়ে বড় পিরামিড কায়রো শহরের কাছে গিজে নামক স্থানে রয়েছে। এখন

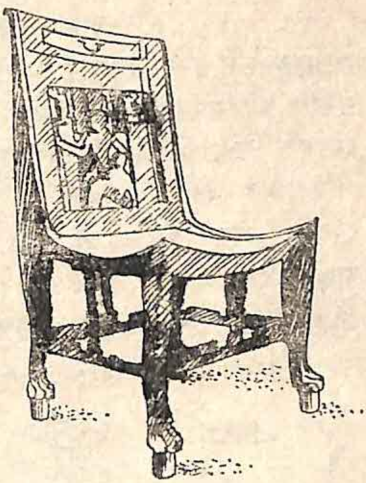
পিরামিড



স্ফিংক্স (সামনে) ও পিরামিড (পিছনে)

থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে খুফু নামক একজন ফ্যারাও এটি

নির্মাণ করেন। এই পিরামিডটি প্রায় পাঁচশ ফুট উঁচু। প্রায় এক লক্ষ লোক কুড়ি বছর পরিশ্রমে এই বিরাট সমাধি-মন্দির নির্মাণ করে। কয়েক বৎসর পূর্বে টুটেন্‌খামেন নামে একজন ফ্যারাওর কবর খুঁড়ে অনেক জিনিস পাওয়া গিয়েছে।



টুটেন্‌খামেনের আসন

মিশরের আর একটি বিখ্যাত কীর্তি হল কারণাক শহরে অ্যামনের মন্দির। এই মন্দিরের দেয়ালে অনেক খোদাই করা মূর্তি আছে। তার অনেকগুলোতে যুদ্ধের দৃশ্য। ফ্যারাও কি করে শত্রুদের পরাজিত করেছেন তা দেখানো হয়েছে। মূর্তিগুলোর উপর নানা রকম রং করা ছিল। এখন তা প্রায় উঠে গিয়েছে।

মিশরে পুরোহিতদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। প্রতি মন্দিরেই পুরোহিত ছিলেন। তিনিই পূজার কাজ ও মন্দির পরিচালনা করতেন। মন্দিরের অনেক জমিজমা ছিল। এ থেকে অনেক আয় হত। পুরোহিতরাই তা ভোগ করতেন। এই সব চাষের জমির জন্য পুরোহিতদের রাজাকে কোন কর দিতে হত না। মিশরে পুরোহিতরাই লেখাপড়ার চর্চা করতেন। মন্দিরের সঙ্গে বিদ্যালয় থাকত। তাতেই তাঁরা শিক্ষকতা করতেন। সুতরাং সম্পদে ও বিদ্যাবলে পুরোহিতরা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ধর্মের কথা বলে

পুরোহিত

তাঁরা দরিদ্র প্রজাদের শান্ত রাখার চেষ্টা করতেন। পুরোহিতরা তাদের পরলোকের শান্তির জন্য এই জীবনের দুঃখ কষ্ট মেনে নিতে উপদেশ দিতেন। রাজা, পুরোহিত, জমিদার ও অন্যান্য সম্পত্তিবান শ্রেণী মিশরীয় সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ ছিল। তারা চাষীদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের অনেকটা অংশ আদায়

প্রজাদের উপর অত্যাচার

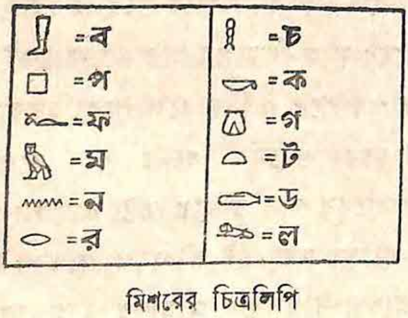
করে নিত। তারা প্রজাদের বেগার খাটাতো এবং দাসদের দিয়ে খামারে কাজ করাতো। তার উপর ছিল কর আদায়কারীদের নানারকম জুলুম। খাজনা না দেওয়ার অপরাধে প্রজাদের রাজকর্মচারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত করা হত। হাজার হাজার লোককে খাটিয়ে রাজারা নিজেদের সমাধি মন্দির নির্মাণ করতেন। কাজে অবহেলা হলে তাদের চাবুক মেরে শাস্তি দেওয়া হত। মিশরের বিশাল পিরামিডগুলো ছিল বেগার পরিশ্রমের মস্তবড় নিদর্শন। মিশরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া মানুষের দেহের ভাঙা হাড়ের সংখ্যা দেখে ঐতিহাসিকরা প্রজাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন, সেকালের সাধারণ মিশরীয়দের জীবন মোটেই সুখের ছিল না।

মিশরের মন্দির এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক প্রাচীন লিপি



মিশরের শব্দচিত্র

পাওয়া গিয়েছে। এইসব লেখা থেকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়। এইসব লেখা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হবে। মিশরের প্রাচীন লিপি অনেকটা ছবির মত। পাথরের উপর এই ধরনের লেখাকে ইংরেজিতে হায়ারোগ্লিফিক (hieroglyphic) বলে। বাংলায় একে চিত্রলিপি বলা যায়। পাশে কয়েকটি হায়ারোগ্লিফিকের নমুনা দেওয়া হল।



মিশরের চিত্রলিপি

পাথরের উপর যে লেখা হত তা রাজা-রাজড়াদের কীর্তি। অন্য লোক লিখবার জন্য পেপিরাস ব্যবহার করত। এই পেপিরাস থেকে ইংরেজী শব্দ পেপার এসেছে। মিশরের জলাভূমিতে নল-খাগড়ার মত একপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। তাকে ছোট করে কেটে চাপ দিয়ে পেপিরাস তৈরি হত। তার উপর খাগের কলম দিয়ে লেখা হত। ভুসা কালির সাথে আঠা ও জল মিশিয়ে লিখবার কালি প্রস্তুত হত। পেপিরাস ত্রিশ-চল্লিশ গজ পর্যন্ত লম্বা হত। লেখা হয়ে গেলে গোল করে গুটিয়ে রাখার রীতি ছিল।

পেপিরাস

অনেকদিন পর্যন্ত হায়ারোগ্লিফিক পড়তে পারা যায় নি। কুড়ি বছর কঠোর পরিশ্রম করে উনবিংশ শতাব্দীতে শাম্পলিয়ঁ নামক একজন ফরাসী ঐতিহাসিক এই লিপি পড়বার উপায় বের করেন। তার ফলেই মিশরের ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে।



পেপিরাস

মিশরে লিখিত পত্র ও সরকারী কাগজপত্র যা পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় সরকারী কাজ করতে হলে শিক্ষালাভ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সরকারী রাজকোষের নানা রকম দলিল লিখে রাখবার জন্য অনেক দক্ষ মুনসি বা মুহুরির দরকার। তাই মিশরে এক বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় ছিল যেখানে বালকেরা মুনসি হিসেবে অফিসে কাজ করার শিক্ষা লাভ করত। এই শিক্ষার কেবলমাত্র ব্যবহারিক মূল্যই ছিল। সত্যের অন্বেষণ করা অথবা জ্ঞান আহরণ করা এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। মুনসির কাজ করবার দক্ষতা অর্জন করায় এইসব সরকারী কর্মচারীদের স্থান উচ্চে ছিল। এই কারণে অল্প বয়সেই বালকদের অভিভাবকরা এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিতেন। নীতিশিক্ষার পাঠ গ্রহণের সঙ্গে তাদের ভাল করে লিখবার পদ্ধতিও আয়ত্ত করতে

মুনসি, মুহুরি বা লেখক

হত। তারা হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লিখত। এই মুনসিদের আবির্ভাবের ফলে মিশরের সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণী দেখা দিতে লাগল। শিক্ষিতরা ভাল সরকারী পদ পেত। এইসব মুনসিরা প্রাচীনকালের মিশরের নীতিবাক্য ও সাহিত্য ইত্যাদি নকল করে রাখার ফলে তা রক্ষা পায়। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সাংসারিক প্রয়োজনে হলেও শিক্ষিতদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তি প্রকৃতি ও জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করেন।

শিল্পকলা

মিশরে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প খুব উন্নত হয়েছিল। শিল্পীরা পাথর, কাঠ, তামা দিয়ে মূর্তি তৈরি করত। তাদের চিত্রশিল্পে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালকে 'পিরামিডের যুগ' বলা হয়। ফ্যারাওরা পিরামিড নির্মাণ করতেন বলে শিল্পকলায় ও স্থাপত্যে অনেককাল পর্যন্ত একই রীতির প্রকাশ দেখা যায়। পিরামিড নির্মাণ ধর্ম ও পরকালের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দেখতে সুন্দর না হলেও পিরামিডের বিশেষত্ব ও গাম্ভীর্য সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণতঃ পুরোহিতরাই চিকিৎসা করতেন। মানুষের শরীর সম্বন্ধে তাঁদের কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। তাদের তন্ত্রমন্ত্রেও খুব বিশ্বাস ছিল। তাঁরা মনে করতেন মন্ত্র উচ্চারণ করলে রোগ সেরে যায়। মিশরে ইম্‌হোটেপ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসক বলা হয়। মিশরে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরোহিতরা গ্রহ-নক্ষত্রেরও খবর রাখতেন। প্রাচীন মিশরে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে চর্চা হত। মিশরীয় পঞ্জিকা খুবই প্রাচীন; সহজ ও বিজ্ঞান সম্মত। মিশরীয় পণ্ডিতরা ২৪ ঘণ্টায় দিন, ৩০ দিনে মাস ও ৩৬৫ দিনে বছর ভাগ করেন। তাঁরা রাশিচক্র ও আকাশের বিভিন্ন তারা সম্বন্ধে পরিচিত

ছিলেন। মিশরীয়দের পাটীগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মিশরীয় জ্যামিতি বেশ উন্নত ছিল। গ্রীকরা পরে মিশরীয়দের কাছ থেকে গণিতবিদ্যা আয়ত্ত করে।

॥ তিন ॥

সিন্ধু-উপত্যকা

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মত আমাদের দেশেও নদীর তীরে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। সিন্ধু দেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদড়ো ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলার হরপ্পা ছিল এই সভ্যতার কেন্দ্র। সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা অনেকটা উত্তরে অবস্থিত। দেশ ভাগ হয়ে যাবার ফলে এই দুই জায়গা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। সিন্ধী ভাষায় মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ হল 'মৃতের সমাধি' বা 'স্তূপ'। সেই বছরেই রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় অনুরূপ ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের চেষ্টায় এই দুই জায়গায় ব্যাপক খনন কার্য শুরু করা হয়। তার ফলে ভারতবর্ষের এক লুপ্ত সভ্যতার কথা জানা যায়। কাশীনাথ দীক্ষিত, ননীগোপাল মজুমদার, মার্টিমার-হুইলার প্রভৃতি পণ্ডিতরাও এই সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কারে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এখানে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে সে সব পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা বলেন, খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় এক সুসমৃদ্ধ ও সুগঠিত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল

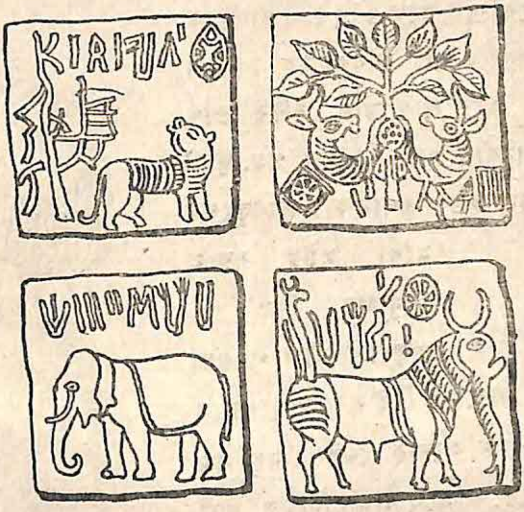
মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সাথে কোন কোন বিষয়ে এই সভ্যতার মিলও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার বিষয়ে এখনও



আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। কারণ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত সীলমোহরগুলোতে খোদিত লেখা এখনও পর্যন্ত পড়া সম্ভব হয়নি। সেগুলোর ভাষাও আমরা জানিনা। এই লিপিকে চিত্রলিপিরই (pictograph) এক বিশেষ অবস্থা বলা যায়। সুতরাং এখানে যে সভ্যজাতির বাস ছিল তাদের ইতিহাস এখনও জানা যায়নি। পরবর্তী কালে আরও অনেক স্থান খনন করে দেখা গিয়েছে যে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই সভ্য

লিপি

জাতির বাস। সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত ও গঙ্গানদীর উপত্যকায় এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল।



মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহর

কিন্তু ইতিহাস না জানা গেলেও মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে তখনকার জীবনযাত্রার আভাস পাওয়া যায়। এখানে এক বিশাল ও সুন্দর নগর ছিল। এই শহরের রাস্তাগুলো খুব প্রশস্ত; শহর আলোকিত করবার ব্যবস্থাও ছিল। দুই ধারে ইটের তৈরি বাড়ি, কতগুলো বাড়ি দোতলা কিংবা তেতলা। বাড়িতে স্নানাগার ছিল। এখনকার মতই ময়লা জল নিকাশের জন্য রাস্তার ধারে নর্দমা ছিল। দুই পাশের বাড়ির স্নানাগার হতে জল এসে রাস্তার নর্দমায় পড়ত। স্বাস্থ্যরক্ষার এরূপ ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা তখনকার পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। একটি বড় স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। তার চারিদিকে সিঁড়ি ও ঘর ছিল। কাঠের তৈরি আসবাবের ব্যবহার ছিল বলে মনে হয়। কোনও কোনও বাড়িতে কাঠের টুকরো পাওয়া গিয়েছে। এই নগরের পরিকল্পনা দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন,

নগর

সুদক্ষ পূর্ত বিজ্ঞানীদের দ্বারা এই নগর নির্মিত হয়েছিল। এখানকার সভ্য অধিবাসীরা নাগরিক জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। এই সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা।



মহেঞ্জোদড়োর মূর্তি

কৃষিকাজ ও পশুপালন

নগরকেন্দ্রিক হলেও এই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কৃষিকর্মের বিকাশ ঘটেছিল। মহেঞ্জোদড়োর বেশীর ভাগ লোকই চাষবাস করত। যব, গম, তুলা প্রভৃতির চাষ হত। এখানকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মটর, সরষে তরমুজের বীজ ও খেজুরের বীজ পাওয়া গিয়েছে। কাজেই এই সব জিনিসের যে চাষ হত তাতে সন্দেহ নেই। বড় বড় শস্যাগার দেখে মনে হয় দুর্দিনের জন্য শস্য সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা ছিল। হরপ্পায় এক বিরাট শস্যাগার পাওয়া গিয়েছে। কুমোরের চাকাতে গড়া বড় বড় মাটির জালায় খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখা হত। এখানকার অধিবাসীরা গম, বার্লি, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি খেত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল ষাঁড়, গরু, মোষ, ভেড়া, হাতী, উট, শূকর, ছাগল, মোরগ প্রভৃতি। সম্ভবতঃ কুকুরও ছিল, কিন্তু ঘোড়া ছিল কি না বলা কঠিন। বনে যে সব জন্তু ছিল তার মধ্যে বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, খরগোস প্রভৃতির নাম করা যায়।

ব্যবহার্য জিনিস

মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত। কিন্তু তারা লোহার ব্যবহার জানত না। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ সুতোর কাপড় পরত, পশমের কাপড়েরও চলন ছিল। মেয়েরা একরকম ঘাগড়া ব্যবহার করত। এখানে বিলাসিতার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কারপ্রিয় ছিল; হার, বালা, আংটি

ছেলে-মেয়ে সকলেই পরত। নাকছাবি, কানের দুল, পায়ের মল, কোমরে চন্দ্রহার ইত্যাদি শুধু মেয়েরাই পরত। অলঙ্কার সোনা, রূপা, তামা ও হাতীর দাঁতের তৈরি হত। গহনায় নানারকম দামী পাথরের ব্যবহার ছিল। চোখে কাজল দেবার রীতি ছিল বলে মনে হয়। তারা বাড়িতে তামা ও ব্রোঞ্জ এবং মাটির পাত্র ব্যবহার করত। হাতীর দাঁতের চিরুণী ও ছুঁচ, তামা ও ব্রোঞ্জের কাস্তে, মাছ ধরার বঁড়শি, ক্ষুর ইত্যাদির প্রচলন ছিল। নানারকম খেলনাও তৈরি হত। তখন পাশা খেলারও প্রচলন ছিল।

দুর্গ ও অস্ত্রশস্ত্র

সেকালের লোকেরা আত্মরক্ষার জন্য মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় সুরক্ষিত দুর্গও নির্মাণ করে। এখানে মাটির তলায় বর্শা, ছোরা, কুঠার, তীরধনুক, গদা প্রভৃতি অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। অস্ত্রগুলো তামা কিংবা ব্রোঞ্জে তৈরি হত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা নৌকো বানাতে জানত। নৌকো করে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত। এই ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বহু জায়গা এবং দেশের বাইরে আফগানিস্তান, ইরান, মধ্য এশিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফৎ একে অন্যকে প্রভাবিত করে। বেলুচিস্তান ও পারস্য দিয়ে স্থলপথে, অথবা আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর দিয়ে সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে ঐসব অঞ্চলের বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। সীল-মোহর ও দ্রব্যাদির বিনিময়ের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেব-দেবী

সিন্ধু উপত্যকায় শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে কোনও মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাই বলে যে দেব-দেবী পূজো হত না তা নয়। মাটির তলায় পাওয়া সীলমোহরের মধ্যে একটি দেব-মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিটির তিন মুখ এবং মাথার দিকে দুইটি শিং; মূর্তিটির সঙ্গে কয়েকটি জীবজন্তুও আছে। অনেকে মনে করেন এই মূর্তিটি শিবের এবং এখানে

শিবপূজা প্রচলিত ছিল। হরপ্পায় শিবলিঙ্গের মত পাথর পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া অনেক ছোট ছোট দেবী মূর্তিও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়েছে। একজন দেবীর খুব প্রতিপত্তি ছিল, তিনি খুব পূজো পেতেন। তার নাম অম্বিকা। অনেকের ধারণা, অম্বিকা মূর্তির পূজো পশ্চিম এশিয়াতেই প্রথম শুরু হয়। মহেঞ্জোদড়োতে শিব অপেক্ষা অম্বিকা দেবীর প্রভাব বেশী ছিল। এখানে পুরুষ দেবতাদের প্রাধান্য কম ছিল। সাপ, কুমীর, ষাঁড় প্রভৃতি কোন কোন প্রাণীকেও পবিত্র বলে মনে করা হত। সিন্ধু উপত্যকায় মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া কিংবা দাহ করা হত। উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল।



সিন্ধু উপত্যকার দেব-মূর্তি

মহেঞ্জোদড়োতে ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মাটির পাত্রগুলোর বাইরের দিক খুবই মসৃণ, তার কোনটির উপর আবার মিনা করা। মাটির



হরপ্পায় প্রাপ্ত মাটির পাত্র

পাত্র, অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিসপত্রের গঠন পদ্ধতি দেখে এখানকার অধিবাসীদের কারিগরীর দক্ষতা ও শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

মূর্তি নির্মাণেও তাদের পটুতা ছিল। হরপ্পাতে যে পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তা স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে মূল্যবান। সীলমোহরের ও প্রস্তর-মূর্তির উপর খোদিত জীবজন্তু দেখে বোঝা যায় তখন চারুশিল্প কতটা উন্নত ছিল।

শিল্পকলা

সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত নানা জিনিস ও উন্নত নাগরিক-অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এখানে নানাশ্রেণীর ও পেশার লোকেরা বাস করত—শাসক, সম্পত্তিবান ব্যক্তি, পুরোহিত, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, কারিগর, কৃষক, সৈনিক, সাধারণ মানুষ প্রভৃতি। কামার, কুমোর, তাঁতী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির বিশেষ ভূমিকা ছিল। তুলা ও পশমের সূতা কেটে তা দিয়ে তাঁতীরা বস্ত্র তৈরি করত। তখনকার কারিগররা টাকু নির্মাণ করতে জানত। কুমোরেরা চাকার সাহায্যে মাটির পাত্র তৈরি করত। তারা গোলাকার চুল্লীতে পাত্রগুলোকে পোড়াত। এখানে রঙীন ও চিত্রিত বিশেষ ধরনের মাটির পাত্রও পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য দেশেও সিন্ধু উপত্যকার মাটির পাত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার শিল্পীরা কাচের মত চকচকে ও মসৃণ চীনামাটির পাত্রও তৈরী করত। এখানকার কামারেরা সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল ও সীসা এইসব ধাতুর ব্যবহার জানত। তা দিয়ে তারা নানারকম জিনিসপত্র তৈরি করত। এখানে ছোটবড় নানা ধরনের যেসব ওজন পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার লোকেরা মাপজোখ ও হিসেব নিকাশের ব্যাপারে পটু ছিল। এখানে কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকায় ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ের তথ্য খুব সামান্যই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তা থেকে অনেকে অনুমান করেন আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সূত্রপাত সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকেই হয়। নগর নির্মাণ পদ্ধতি ও জীবনযাত্রা দেখে বোঝা যায় এখানকার অধিবাসীদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। এখানে নানারকম শ্রমজীবী মানুষ ছিল।

বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশা

গরীব মানুষের পরিশ্রমেই বড় বড় বাড়ি, রাস্তাঘাট, দুর্গ ইত্যাদি নির্মিত হত। সৈনিকদের দায়িত্ব ছিল দেশ রক্ষা করা ও শান্তি বজায় রাখা। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য এখনও জানা যায়নি।

এত বড় শহর এবং সভ্যতা কেমন করে ধ্বংস হয়ে গেল তা বলা যায় না। সম্ভবতঃ বিদেশী শত্রুর আক্রমণে মহেঞ্জোদড়োর পতন হয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, আর্যগণের আগমনের ফলে সিন্ধু সভ্যতার সমৃদ্ধিশালী শহরগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটে। বৈদিক আর্যগণ সিন্ধু সভ্যতার তুলনায় পিছনে থাকলেও তারা লোহার ব্যবহার জানত। ঘোড়াকে কাজে লাগাতে পারত বলে তাদের যুদ্ধক্ষমতাও বেশী ছিল। তাই তাদের কাছে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা পরাজিত হয়। সভ্যতায় অগ্রগামী জাতির লোকেরা অনগ্রসর জাতির নিকট পরাজয় বরণ করেছে এমন ঘটনা ইতিহাসে অনেক পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের আর একটি কারণও অনেকে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে, সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে অস্বাভাবিক জল-প্লাবনের ফলে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ

॥ চার ॥

চীন

চীন দেশেও সভ্যতার আরম্ভ হয় নদীর তীরে। এখানে কৃষিপ্রধান সভ্য সমাজ গড়ে ওঠে উত্তর দিকে হোয়াংহো নদীর (পীত নদী) উর্বর অঞ্চলে, আর তার দক্ষিণে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপকূলে। এই দুই নদীই চীনের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত। অনেক কাল আগেই এই দুই নদীর তীরে সভ্য জাতির বসতি ছিল। তারা বাইরের অন্য কোন দেশ থেকে এসেছিল বলে মনে হয় না। এখানেও প্রাচীনকালে চীনের মানুষকে সংগ্রাম করে প্রকৃতিকে বশে

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকা

আনতে হয়েছে। তারা বাঁধ নির্মাণ করে জল-প্লাবনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে; খাল কেটে ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা করেছে। এইভাবে তারা চাষ-বাস আরম্ভ করে এবং সভ্য সমাজ গড়ে তোলে।

চীনা রূপকথার ইতিহাস

চীনদেশের উৎপত্তি ও সেখানকার লোকদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। চীনাদের রূপকথায় আছে প্রথমে কেবল একজন মানুষের জন্ম হয়েছিল, তাঁর নাম প্যান কু। তিনি অনেক হাজার বছর বেঁচেছিলেন। মানুষ, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, হ্রদ, সাগর সমস্তই তাঁর হাতের তৈরি। তারপর আবির্ভাব হল কয়েকজন রাজার। তাঁদের আমলেই চীনে সভ্য জীবনের আরম্ভ হয়। চীনা উপাখ্যানে আছে চার হাজার বছর আগে চীনের অনেকগুলো জাতি (Tribe) মিলে হুয়াং টি নামক একজনকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় হুয়াং টি ছিলেন খুব শক্তিশালী শাসক। তিনি 'পীত সম্রাট' নামেও পরিচিত। তাঁর সময়ে চীনের লোকেরা গুটিপোকা পালন, নৌকো ও মালটানা গাড়ী তৈরি ইত্যাদি শেখে। লেখাপড়ার চর্চাও আরম্ভ হয়। তাঁর পরে ইয়াও, সুন এবং উ রাজা হন। যখন ইয়াও সিংহাসনে ছিলেন তখন হোয়াংহো নদীতে

বন্যা প্রতিরোধ

ভয়ানক প্লাবন হয়। তিনি একটি সভা ডেকে সবাইকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় আলোচনা করেন। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উ-র পিতা কুনকে বন্যা প্রতিরোধের দায়িত্ব দেওয়া হল। কুন এই কাজে সফল হননি। এই অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তারপর উ তেরো বছর একটানা পরিশ্রম করে পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করেন। উ বন্যার জল নদীতে এবং পরে সমুদ্রে প্রবাহিত করে দেন। সুনের পর উ চীনের রাজা হন। তাঁর সময়েই চীনে ধনী ও দরিদ্র এই পার্থক্য দেখা দেয়। উ-র পুত্র চী সিংহাসন দখল করে সীয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বছর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫২০ বছর পর্যন্ত সীয়া রাজবংশ রাজত্ব করে।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫২০ অব্দে সীয়া রাজবংশের শেষ রাজা চীয়েকে পরাজিত করে তাং নামক একজন নেতা শাং রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকে চীনে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। হোয়াংহো নদীর তীরে এই শাং বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচ শত বছর এই বংশ রাজত্ব করে। হোয়াংহো নদীর বন্যার জন্য তাদের রাজধানী পাঁচবার স্থানান্তরিত করতে হয়। রাজা পান কেং-এর রাজত্বকালে ইন অঞ্চলে (বর্তমান হোনান প্রদেশ) রাজধানী করা হয়। ইন শহর প্রায় ২৭০ বছর শাং বংশের রাজধানী ছিল। তা থেকে বোঝা যায় শাং যুগের লোকেরা বন্যা সমস্যার অনেকটা সমাধান করতে পেরেছিলেন। ইন রাজাদের পতন হলে তাঁদের রাজধানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই ধ্বংসস্তূপ 'ইনের ঢিপি' নামে পরিচিত।

শাং রাজবংশ

ইনের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে অনেক জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে শাং আমলের চীন দেশের জীবনযাত্রা কি রকম ছিল আমরা



চীনের মৃৎপাত্র

ধারণা করতে পারি। এই সময় ব্রোঞ্জের পাত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার

ছিল। মাটির পাত্রও তারা ব্যবহার করত। সেকালের সাদা মাটির বাসন দেখতে খুব সুন্দর ছিল। শাং যুগে রেশমী কাপড়ের ব্যবহার দেখা যায়। তখন শণ ও অন্যান্য গাছের আঁশ থেকে কাপড় বোনার কৌশল চীনের তাঁতীরা শিখে নেয়।

বিভিন্ন জিনিস

শাং যুগের আগেই চীনে চিত্রলিপি প্রচলিত ছিল। সেকালে চীনারা হাড়ের উপর ও কচ্ছপের খোলার উপর দাগ কেটে লিখত। শাং যুগের লেখা অনেক কচ্ছপের খোলা পাওয়া গিয়েছে।



হাড়ের উপরে চীনা লেখা

সেকালে চীনারা আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা মনে করে পূজো করত। কারণ আকাশ ও পৃথিবী থেকেই সমস্ত জীবজগতের উৎপত্তি। শাং যুগের লোকের ধারণা ছিল মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে, তার বিনাশ নেই। সেইজন্য চীনে খাদ্য-পানীয় নিবেদন করে পিতৃপুরুষদের পূজো হত। আর মৃত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ কবর দেওয়া হত।

ধর্ম

শাং যুগের বেশীর ভাগ লোকই চাষবাস করত। তখন ধান, গম, ও জোয়ার প্রভৃতি শস্যের চাষ হত। পোষা জন্তুর মধ্যে ছিল ঘোড়া, শূকর, ষাঁড়, মুরগী, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি। কচ্ছপের খোলায় আঁকা ছবি দেখে মনে হয় চীনে হরিণ, নেকড়ে, বাঘ, হাতী ও গণ্ডার ছিল। চীনারা কাঠি দিয়ে ভাত খায় আমরা জানি। শাং বংশের এক রাজা কাঠির ব্যবহার আবিষ্কার করেন।

কৃষিকাজ ও পশুপালন

শাং যুগের সমাজ ক্রীতদাস, কৃষক ও সামন্ত—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। চীনে জমিদাররা কৃষক ও ক্রীতদাসদের অত্যাচার করত। রাজারা সামন্তদের স্বার্থই রক্ষা করতেন। অত্যাচারের ফলে প্রজারা বিদ্রোহও করে।

সমাজে শ্রেণীভেদ

শাং বংশের এক রাজার আমলে এই রকম এক বিদ্রোহের সময় একজন সামন্ত শাং রাজাকে পরাজিত করে সিংহাসন কেড়ে নেয়। তখন থেকেই চীনে চৌ রাজবংশের আরম্ভ হল।

॥ পাঁচ

প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

এশিয়া ও আফ্রিকার বড় নদীগুলোর ধারে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটে তা প্রায় একই সময়কালের সৃষ্টি। এদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও এর উপাদান ও স্বরূপ এক। এই সভ্যতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করছি। প্রধানতঃ এই সভ্যতা ছিল কৃষিপ্রধান। বাঁধ নির্মাণ ও জলসেচনের উপর লোকদের নির্ভর করতে হত। মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু-উপত্যকা ও চীন দেশের যে সব জায়গায় এই সভ্যতা গড়ে ওঠে তা অনেক জায়গায় বিস্তৃত ছিল; কোন ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। একটা প্রধান কেন্দ্রকে ঘিরে তার চারিপাশে এই সভ্যতার বিস্তার হত। কোন একটা বিশেষ কেন্দ্রকে ঘিরে উপগ্রহের মত বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে ওঠায় একে 'উপগ্রহ সভ্যতাও' (Satellite Civilizations) বলা হয়েছে। এই সময়ে অর্থনৈতিক জীবনও অনেক উন্নত ছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এই সব অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। প্রচুর শস্য উৎপাদন হওয়ায় ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে ধন সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। তার ফলে ধনী সম্পত্তিশালী লোকদের আবির্ভাব হয়।

কৃষিপ্রধান সভ্যতা

ব্যাপক অঞ্চলে প্রসারিত

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন

সমাজে ধনী ও দরিদ্র এই বৈষম্য দেখা দেয়। ধর্মকে আশ্রয় করে পুরোহিত সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব হয়। শাসক, পুরোহিত ও জমিদার এদেরই ছিল সমাজে বেশী প্রভাব। কৃষিই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। ক্রীতদাসদের ও দরিদ্রদের চাষবাস এবং অন্যান্য কাজে লাগানো হত। তাদের পরিশ্রমের ফলে সেকালের বড় বড় প্রাসাদ নির্মিত হয়। সুতরাং এই সমাজে কৃষক, পশুপালক, শাসক, জমিদার, পুরোহিত, কারিগর, দরিদ্র, ক্রীতদাস প্রভৃতি নানা পেশা ও জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তির ও শ্রেণীর কথা পাওয়া যায়। কয়েকটি দেশে অত্যাচারের ফলে বড় প্রজা বিদ্রোহও হয়। সমাজে বৈষম্য, তিক্ততা ও বিরোধের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

নানা পেশা ও শ্রেণী

প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চল ভিত্তি করে কৃষিকাজ ও পশুপালন হলেও, শহরও গড়ে ওঠে। কৃষিপ্রধান গ্রাম্যজীবনের পাশাপাশি ছিল নাগরিক জীবন। এই সব শহরে নাগরিক জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। প্রাচীন সভ্য দেশগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নাগরিক সভ্যতা।

নগর-সভ্যতা

এই সময়ে ব্রোঞ্জের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মাটি খুঁড়ে পাওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র, প্রাসাদ, মন্দির, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা, যানবাহন ইত্যাদির নির্মাণ ও গঠন পদ্ধতি দেখে বোঝা যায়, সেকালের লোকদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতা

গণিত ও জ্যোতিষের আবির্ভাবের সাথে কৃষি নির্ভর সভ্যতা ও অর্থনীতির সম্বন্ধ ছিল স্বাভাবিক কারণেই নিবিড়। আদিম পূর্তবিদ্যাও গণিতের অগ্রগতির সহায়ক ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলেও গণিতের অগ্রগতি হয়। ঘরবাড়ি ও নগর নির্মাণে এবং সেচ বিষয়ক পূর্তবিদ্যায় সুমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চীনাদের সাফল্য গাণিতিক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের উন্নতির জন্য সম্ভব হয়েছিল।

দেব দেবীর পূজো সব দেশেই ছিল। তখনকার লোকদের ধর্ম-বিশ্বাসও খুব ছিল।

এই সভ্যতার আমলে এক উন্নত সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। সব অঞ্চলেই লিখিত ভাষা ছিল। লেখাপড়ার চর্চাও হত। শিল্প-কলার ক্ষেত্রেও তখনকার লোকরা উন্নত ছিল। পণ্ডিতরা মানুষের জ্ঞানের পরিধিকেও প্রসারিত করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা দেখে সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় আমরা পাই। আর এই জ্ঞান যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ত, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লৌহ যুগের সমাজ

তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে দক্ষতা অর্জনের পর সেকালের মানুষ লোহা আবিষ্কার করে। এশিয়া-মাইনর লৌহ খনিজে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আকরোদ্ভূত ধাতুপিণ্ড গলিয়ে লোহা তৈরি করার পদ্ধতি এশিয়া-মাইনর ও ককেশাশ অঞ্চলের লোকেরা আয়ত্ত করে। ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে এই-ভাবে লোহা তৈরির ব্যাপারে এশিয়া-মাইনরের হিটাইটদের প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। তখন থেকেই লোহার ব্যবহার শুরু হয় এবং ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই সব অঞ্চলে পূর্ণ লৌহ যুগের সূত্রপাত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দে মিশরের রাজা হিটাইটদের রাজার নিকটে লোহা পাঠাতে অনুরোধ করে এক পত্র লেখেন। তার উত্তরে হিটাইটদের রাজা মিশরের রাজাকে লোহার পরিবর্তে সোনা পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেই পত্রালাপের মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। তা থেকেই লৌহ শিল্পে হিটাইটদের প্রাধান্যের কথা পরিষ্কার জানা যায়। ক্রমশঃ সেখান থেকে পূর্বাঞ্চলে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। ককেশাশ অঞ্চলে সেকালের কবর খুঁড়ে লৌহ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া

গিয়েছে। প্রাচীন আসিরীয়া রাজ্যের রাজধানী নিনেভে শহরের ধ্বংসস্তূপ খনন করে প্রচুর লোহার অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষেও ১০৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে খনন করে লৌহ নির্মিত তীর, কুঠার, বর্শা ও অন্যান্য জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, সীসা ও টিন ব্যবহারের কথাও পাওয়া যায়; আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ভারতীয়রা খুব উন্নতমানের ইস্পাত তৈরি করতে জানত।

প্রাচীনকালে ইউরোপের দানিয়ুব উপত্যকার হল্স্টাট নামক জায়গা লৌহ শিল্পের জন্য খ্যাত ছিল। পূর্বদেশ হতে কেলট, ডোরিয়ান প্রভৃতি জাতিরা এসে দানিয়ুব উপত্যকায় বসতি করে। তারাই এশিয়া মাইনরের লৌহ নিষ্কাশন সম্পর্কিত ধাতুবিদ্যা পদ্ধতি এই অঞ্চলে প্রচলিত করে। লোহা ব্যবহারকারী কেলট, ডোরিয়ান প্রভৃতি জাতিদের আক্রমণের ফলেই ক্রীট দ্বীপের নসস্-এর ব্রোঞ্জ সভ্যতার পতন ঘটে। তখন থেকেই ক্রীট ও ঈজিয়ন সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে লৌহযুগের সূচনা হয়। তার কিছু পরেই এখানে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

লৌহ যুগ আরম্ভ হবার পরে নতুন শহর গড়ে ওঠে। যে সব জায়গা বসবাসের জন্য সেখানে বড় বড় বাড়ি নির্মাণ করা হত। এই যুগে মানুষের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। নানা কাজে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হল। লোহার লাঙ্গলের ফাল ব্যবহৃত হওয়ায় চাষের কাজেরও সুবিধা হল। ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হল। জিনিস ওজন ও মাপ করার পদ্ধতি উন্নত হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। জিনিসপত্র সহজে বিনিময় করার জন্য মুদ্রার প্রচলন হয়। এই যুগে মুখের ভাষা বদলাল। লিখবার ভাষাও উন্নত হল। যে সব দেশে লৌহ যুগ প্রবেশ করে সেখানে সাংস্কৃতিক জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক সাহিত্য লৌহযুগের সৃষ্টি। এই সময়েই সংস্কৃত ভাষা

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়। আর গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে অনেক নতুন বসতি এই যুগেই গড়ে ওঠে।

লৌহযুগের আর একটি বিশেষ ঘটনা হল রাজতন্ত্রের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন দেশে এই যুগে রাজার শাসনের এক সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ব্যাবিলন

সুমের সভ্যতার কথা আগেই বলা হয়েছে। সুমেরীয়রা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি বলে তারা কয়েক শত বছর আক্কাদ রাজ্যের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আক্কাদ রাজ্যের ক্ষমতাও ধ্বংস হয়ে যায় এবং ব্যাবিলন রাজ্যের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ব্যাবিলন প্রথমে একটি ছোট গ্রাম ছিল। তারপরে ব্যাবিলনীয়রা একটি বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ব্যাবিলনের লোকেরা কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। কৃষকেরা গম, যব, আঙ্গুর, খেজুর এবং নানারকম শাক-সবজী উৎপন্ন করত। ব্যবসায়ীরা শস্য, চামড়া, পশম ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য কৃষকদের নিকট থেকে কিনে স্থলপথে গাধার পিঠে চাপিয়ে এবং নদী পথে নৌকো করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। এইভাবে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়।

কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যাবিলন রাজ্যে অনেক শহর ছিল। প্রতি শহরেই ছিল দেবতার মন্দির। আর প্রতি মন্দিরেই একজন করে পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিতের সঙ্গে ব্যাবিলনের রাজাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। পুরোহিতরা খুবই ক্ষমতাশালী ছিলেন। ব্যাবিলন শহরের অধিষ্ঠাতা দেবতাই ছিলেন সবচেয়ে বড়। এই

মন্দির ও পুরোহিত

দেবতার নাম মার্ডুক। এই মন্দিরের গম্বুজকেই বাইবেল ধর্মগ্রন্থে 'ব্যাবেল'-এর মিনার বলা হয়েছে। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে ধনী-দরিদ্র সবাই এই মন্দিরে এসে দেবতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা



হামুরাবির আইন

নিবেদন এবং দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করত। এই উপলক্ষে এখানে বড় উৎসব হত।

ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজার নাম হামুরাবি। তিনি আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করতেন। তাঁর সময় ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। প্রতিবেশী রাজাদের সাথে তাঁর অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। তিনি নিজের রাজ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি চল্লিশ বছরের বেশী রাজত্ব করেন। প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম দেশের প্রচলিত আইন-কানুনগুলি সঙ্কলন করেন। এই সঙ্কলন 'হামুরাবির আইন' নামে খ্যাত। হামুরাবি এই আইন-কানুন একটি বড় পাথরের উপর খোদাই করেন। পাথরটি আট ফুট উঁচু; তার উপর একটি ছবি আছে, হামুরাবি সূর্যদেবের নিকট থেকে আইনের বই গ্রহণ করছেন। এই আইন ছাড়া হামুরাবির লেখা অনেকগুলো চিঠিও পাওয়া গিয়েছে। এই সময় নরম কাদায় লিখে সেই সব লেখা শুকিয়ে নেওয়া হত। এই রকম টালিতে লেখা নির্দেশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও বিচারকদের কাছে পাঠানো হত। এ থেকে আমরা তাঁর শাসন-ব্যবস্থা জানতে পারি। যেখানে নদী নেই, সেখানে খাল কেটে জল আনার কথা একটি পত্র থেকে জানা যায়। আর একটি পত্রে দ্রুত রাজকর দেবার কথা আছে, আর একটিতে ব্যাবিলনে ক্রীতদাস পাঠানোর আদেশ আছে। অন্য এক পত্রে এক জেলায় শস্য পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। সেখানকার ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হামুরাবি

হামুরাবির আইন

হামুরাবির পত্র

হামুরাবির আইন থেকে সেকালের ব্যাবিলনের লোকদের জীবন কেমন ছিল জানা যায়। দোষী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। ঋণ শোধ না করলে দাস হয়ে থাকতে হত। মহাজনরা কাউকে প্রতারণা করলে তাদের ক্ষমা করা হত না। কোনো কোনো আইনে অনাথ, বিধবা অথবা গরীব লোকদের উপর যাতে অত্যাচার না হয় তার ব্যবস্থা ছিল। সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল উঁচুতে। স্ত্রী ও বিধবা উভয়ের অধিকার সুরক্ষিত ছিল।

ব্যাবিলনের সমাজ জীবন

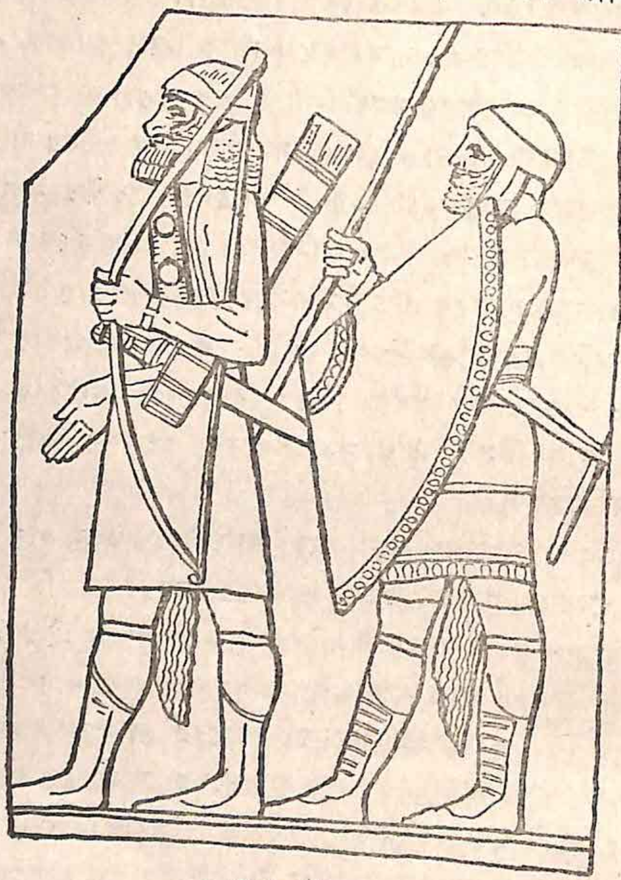
জমি ছিল সমাজের প্রধান সম্পদ। তাই হামুরাবির আইনে কৃষিকাজ, জলসেচন, জমিদার-কৃষকদের সম্পর্ক, খাজনা, ইত্যাদি বিষয়ের কথা আছে। চাষের কাজে ফাঁকি দিলে কৃষককে শাস্তি দেওয়া হত। শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। আইনে বেগার খাটানোর ব্যবস্থাও ছিল। সমাজে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার সযত্নে রক্ষা করা হয়। অবহেলায় রোগীর মৃত্যু হলে চিকিৎসককে শাস্তি দেওয়া হত। নির্মাতার দোষে বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে মালিকের মৃত্যু হলে যে বাড়ি নির্মাণ করেছে তার প্রাণদণ্ড হত। তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। শস্য অথবা অন্যান্য জিনিস সুরক্ষিত স্থানে রাখার ব্যবস্থা ছিল। হামুরাবির আইনের প্রভাব অনেক কাল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরেও এই সব আইন-কানুন প্রয়োগ করা হত।

ব্যাবিলন সাম্রাজ্য ধ্বংস করে আসিরীয়রা প্রধান হয়ে উঠল। তাদের যেখানে প্রথমে রাজধানী ছিল সেই শহরের নাম ছিল অসুর। পরে নিনেভে শহরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আসিরীয়ার রাজা অসুরবাণীপাল খুব শক্তিশালী শাসক ছিলেন। পণ্ডিতরা নিনেভে শহরের ধ্বংসস্তূপ খনন করে অনেক তথ্য বের করেছেন। এই ধ্বংসস্তূপের ভেতরেই অসুরবাণী-পালের বিরাট গ্রন্থাগার পাওয়া গিয়েছে। এখান থেকে কীলক-লিপিতে লেখা বাইশ হাজার মাটির টালি উদ্ধার করা হয়েছে। এই টালিগুলোতে রাজ্যশাসনের কথা, নানা প্রকার দলিল, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্তোত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয় লেখা আছে। এই রকম টালি এখন লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যায়।

আসিরীয় সাম্রাজ্য

আসিরীয়রা যুদ্ধ বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল। তারা লোহার অস্ত্র ব্যবহার করত। তারা এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে। আসিরীয় শাসকরা খুবই স্বেচ্ছাচারী ছিল। তারা নানা জাতিকে লুণ্ঠন করে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করত। আসিরীয়দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্বল জাতির লোকেরা বার বার বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিল। কৃষক ও

ক্রীতদাসরা এই সব বিদ্রোহে যোগদান করে। আভ্যন্তরীণ কলহে আসিরীয় সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ব্যাবিলনের



আসিরীয়ার সৈন্য

লোকেরা আসিরীয়া আক্রমণ করে। ফলে আসিরীয়া ধ্বংস হয়ে গেল।

আসিরীয় সাম্রাজ্য চারশত বছর স্থায়ী হয়। আবার একশতাব্দী ধরে স্বাধীন ব্যাবিলনে এক নতুন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এর নাম কালডিয়া সাম্রাজ্য। এই রাজবংশ ব্যাবিলনের পুরানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে। হামুরারির দেড় হাজার বছর পরে কালডিয়ার রাজা দ্বিতীয় নেবুকডনেজার ব্যাবিলনে রাজত্ব করতেন। বড় যোদ্ধা বলে তাঁর খ্যাতি ছিল।

কালডিয়া সাম্রাজ্য

মিশরের সৈন্যরা তাঁর দেশ আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে তিনি তাদের পরাজিত করেন। তাঁর নাম অন্য অনেক কারণেও বিখ্যাত। তাঁর সময়ে ব্যাবিলন ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পকলায়, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। তিনি বিরাট প্রাসাদ, সুন্দর মন্দির, বীথি ও তোরণ নির্মাণ করে ব্যাবিলন শহরের শোভা বৃদ্ধি করেন। প্রাসাদের ছাদে তিনি যে অপূর্ব উদ্যান নির্মাণ করেন তা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। দ্বিতীয় নেবুকডনেজার ব্যাবিলন শহরের চারিদিকে যে উঁচু ইটের দেয়াল নির্মাণ করেন তা এত চওড়া ছিল যে তার উপর দিয়ে চার ঘোড়ার গাড়ী চলতে পারত। শহরে উঁচু বাড়ি ও মন্দির ইটের নির্মিত ছিল। মন্দিরের গায়ে ছবিও আঁকা থাকত। ব্যাবিলনের অধিষ্ঠাতা দেবতা মার্ডুক-এর মন্দির ছিল সাত তলা উঁচু। মন্দিরে দেবতার চল্লিশ ফুট উঁচু মূর্তি ছিল। মন্দিরের কাছে স্তম্ভের গায়ে মিনার কাজ, বহু দূর থেকে সকলের চোখে পড়ত।

ব্যাবিলন শহরের শোভা

কালডিয়া রাজবংশের আমলে ব্যাবিলনের পণ্ডিতরা বছরকে বার মাসে ভাগ করেন। সপ্তাহের সাত দিনের বিশেষ নামগুলি দেন এবং প্রতি দিবসকে বার ঘণ্টা দিন ও বার ঘণ্টা রাত এইভাবে নির্দেশ করে দেন। নক্ষত্র এবং গ্রহর মধ্যে পার্থক্য তাঁরাই বুঝতে পারেন, তাদের নামকরণ করেন ও তাদের গতি নির্দেশ করে দেন। তখনকার পণ্ডিতদের গবেষণায় আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ব্যাবিলনীয়রা পাটীগণিত ও বীজগণিতে উন্নত ছিল। তাদের জ্যামিতির জ্ঞানও উপেক্ষা করবার নয়। পরে গ্রীকরা তাদের কাছ থেকে এইসব বিদ্যা আয়ত্ত করে।

বিজ্ঞান চর্চা

॥ দুই ॥

মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার : উত্থান ও পতন

উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক রাজার শাসনে আসবার দু হাজার বছর পরে এক বর্বর যাযাবর জাতি মিশর আক্রমণ করে। এরা ছিল আরব দেশের লোক। মেষপালন ছিল তাদের জীবিকা, তারা ঘোড়া পোষ মানাতে জানত। এরা ইতিহাসে হিকসস্ নামে পরিচিত। মিশরীয়রা তখন ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। তাই মিশরের পদাতিক সৈন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহী হিকসস্ সৈন্যদের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়। প্রায় পাঁচশত বছর মিশর বিদেশী হিকসস্‌দের অধীনে ছিল। তারপর দক্ষিণ মিশরের থিব্‌স নামক স্বাধীন রাজ্য হিকসস্‌দের তাড়িয়ে দেয়। থিব্‌স রাজবংশের নেতা ছিলেন প্রথম আহমোস। তিনিই ১৫৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের মুক্তিদাতারূপে শাসনকার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হিকসস্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ করে মিশরীয়রাও যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়। তখন থেকেই ফ্যারাওরা সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। ১৫৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১০৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল মিশরের সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কোন কোন লেখক এই কালকে 'সামরিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে মিশরের লোকেরা ফ্যারাওর জন্য পিরামিড নির্মাণে ব্যস্ত না থেকে তাঁর নেতৃত্বে নিউবিয়া এবং সিরিয়াতে সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

হিকস্‌স্ আক্রমণ

মিশরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

১৫৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম থাটমোস মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করার সময় থেকেই মিশরের সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয়। মিশরের ফ্যারাওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন তৃতীয় থাটমোস। ইতিহাসে তাঁকে পৃথিবীর বড় সেনাপতিদের একজন বলা হয়। তাঁর সৈন্যরা পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্টাইন, সিরিয়া প্রভৃতি জায়গা জয় করে। তাঁর বড় নৌবাহিনীও ছিল।

তৃতীয় থাটমোস

এই নৌবাহিনীর দ্বারা তিনি গ্রীসের দক্ষিণে ঈজিয়ন সাগরের অনেক দ্বীপ জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্য আবিসিনীয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজত্বকালেই মিশরের বাইরে উপনিবেশ ও মিশরীয়দের প্রাধান্য আরও প্রসারিত ও দৃঢ় হয়। তৃতীয় থাটমোস চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করেন। ১৪৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরে তৃতীয় আমেনহোটেপ্ নামক একজন ফ্যারাও রাজত্ব করেন। তাঁর আমলেও মিশর খুব প্রভাবশালী ছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মিশরের পুরোহিতদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মিশরীয় দেবতাকে অধিষ্ঠিত করা হয়। আর এই দেবতাকে কেন্দ্র করে পুরোহিতদের অর্থ ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। পুরোহিত ও রাজা পরস্পরের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখেন। ফ্যারাওরা দেবতাদের প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন করতেন। কোন কোন ফ্যারাও প্রধান পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুরোহিত সম্প্রদায় নির্দিষ্ট কাজকর্ম করতেন।

পুরোহিতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এইভাবে ফ্যারাও একই সঙ্গে ধর্মীয় নেতা ও শাসকরূপে সাম্রাজ্য শাসন করতেন। পুরোহিতরা এত প্রভাবশালী হন যে অনেক সময় রাজাদের মনোনয়নও তাঁদের মত অনুযায়ী হত। এইভাবে মিশরীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্ম ও রাজনৈতিক যোগ স্থাপিত হয়। সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে রাজার ও দেবতার অবস্থান একই সঙ্গে ছিল বলে দেবতার প্রভাবও অনেকটা ব্যাপ্ত হয়।

তৃতীয় আমেনহোটেপের পুত্র চতুর্থ আমেনহোটেপ্ ইতিহাসে ইখনাটন্ নামে খ্যাত। তিনি নিজেকেই প্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি মিশরে এক ধর্ম বিপ্লবের প্রবর্তন করেন এবং মিশরের সমাজ জীবনকে সৎ ও পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাই তাঁকে ইতিহাসের প্রথম পয়গম্বর (Prophet) বলা হয়। ইখনাটনের যুদ্ধবিগ্রহের দিকে তত মন ছিল না। তাঁর মত

একজন কল্পনাবিলাসী রাজা সিংহাসনে বসায় মিশরের শাসন ব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিল। মিশরের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে ফ্যারাওর প্রভাব হ্রাস পায়। এমন কি মিশরের অভ্যন্তরে জনসাধারণ ও পুরোহিত সম্প্রদায় ইখনাটনের ধর্মমতের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করে। ইখনাটন্ যে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন জনসাধারণের উপর তার প্রভাব যথেষ্ট পড়েনি। পুরোহিতরা তাঁর ধর্মমতের বিরোধিতা করেন। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রও হয়। এই অবস্থায় ইখনাটন্ একজনকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইখনাটন্ মারা যান। তাঁর পদত্যাগের পরও মিশরীয় সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর হয়নি। ১৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়।

ইখনাটন্

তারপর দ্বিতীয় রামেসিস নামক একজন ফ্যারাও পুনরায় মিশরের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যুদ্ধ জয়ের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অনেক বছর রাজত্ব করে ১২২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মারা যান। তারপরে মিশরীয় সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী ফ্যারাওরা মন্দির, চতুষ্কোণ স্তম্ভ ও বিশাল মূর্তি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করে নিজেদের শক্তির মহিমা প্রচার করলেও তাঁদের রাজ্য জয় শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। ১০৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে লিবিয়া, ইথিওপিয়া ও অন্যান্য বিদেশী শক্তি মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। এইভাবে বিশাল মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় রামেসিস

সাম্রাজ্যের পতন

॥ তিন ॥

প্রাচীন ইরান

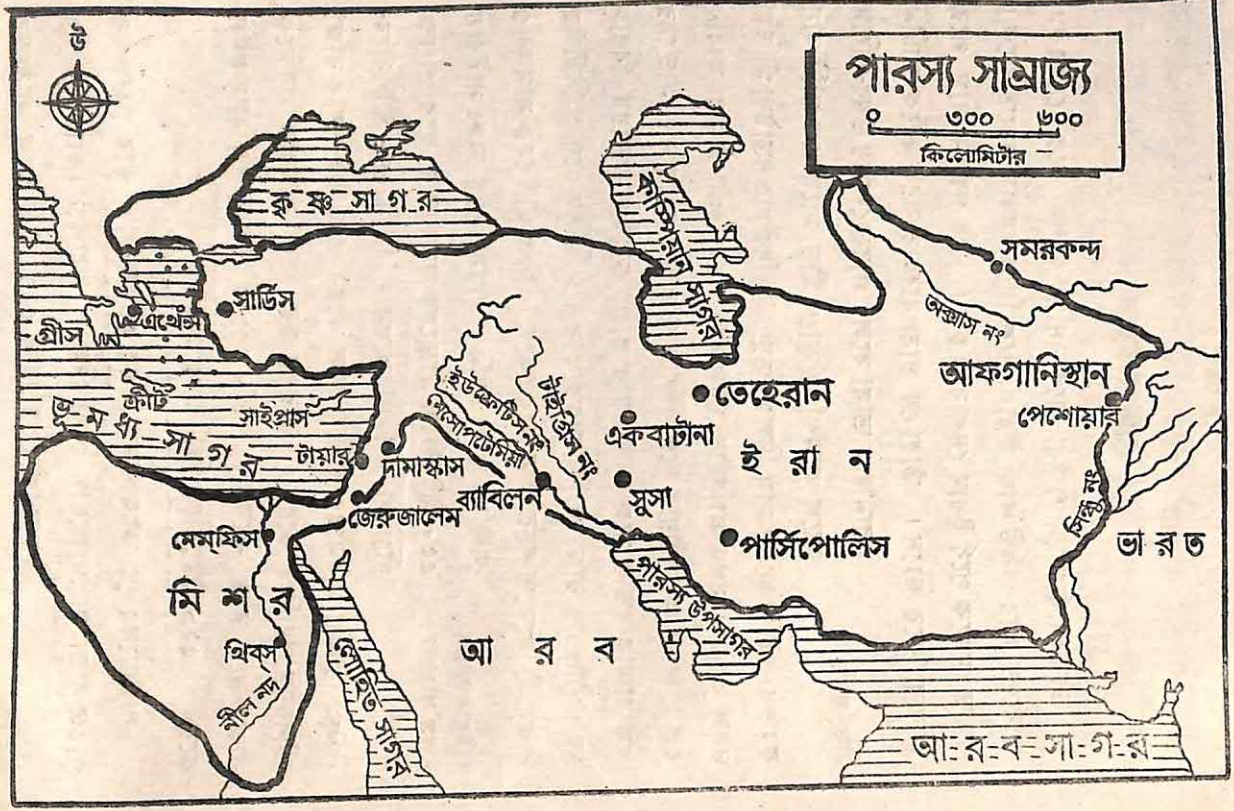
ভারতবর্ষে যেমন আর্যরা এসে বসতি স্থাপন করে, সেইরকম আর্যদের আর একটি শাখা ইরান দেশে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। পারস্য দেশকে পূর্বে ইরান দেশ বলা হত। এই পুরানো নাম পরে আবার ফিরে আসে। তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করত তাকে প্রাচীন ইরানীয়ান ভাষা বলে। পারস্য দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অনেকদিন আগে মীড্ নামে এক জাতি বাস করত। এই অঞ্চলের নাম ছিল মীডিয়া। আসিরীয়ার সম্রাটরা মীডিয়া দখল করেন। যখন আসিরীয়া দুর্বল হয়ে পড়ল তখন মীড্রা স্বাধীন হল। তারা আসিরীয়ার সঙ্গে পূর্বশত্রুতা ভুলতে পারেনি। মীড্দের এক রাজার কন্যার সঙ্গে কালডিয়ার রাজা নেবুকডনেজারের বিবাহ হয়। মীডিয়ার রাজা ব্যাবিলনের রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে আসিরীয়ার রাজধানী নিনেভে শহর ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু মীড্দের সাম্রাজ্যও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। পারসীকদের নেতা সাইরাস ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মীড্দের কর্তৃত্ব ধ্বংস করে পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পশ্চিম এশিয়া-মাইনরের সার্ডিস দখল করেন এবং লাইডিয়ার রাজা ক্রীসসকে পরাজিত করেন। তারপর ছয় বছর সাইরাস পূর্বদিকে রাজ্য জয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন দখল করেন। ৫২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি মারা যান।

মীড্ জাতি

সাইরাস কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেস মিশর জয় করেন। তার মৃত্যুর পর পারস্য সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিল। অবশেষে ক্যামবিসেসের এক আত্মীয় ডেরিয়াস ৫২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্যের সিংহাসনে বসেন। ডেরিয়াস অনেক দূর পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ইউরোপে তাঁর সৈন্যরা থ্রেস ও ম্যাসিডন জয় করে। ডেরিয়াস দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে সিথিয়ানদের

ডেরিয়াস


পারস্য সাম্রাজ্য
০ ৩০০ ৬০০
কিলোমিটার
উ
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
সমরকন্দ
অক্সাস নং
সার্ডিস
এথেন্স
গ্রীস
ক্রীট
সাইপ্রাস
ভূমধ্য সাগর
টায়ার
দামাস্কাস
ইউফ্রেটিস নং
টাইগ্রীস নং
মেসোপটেমিয়া
ব্যাবিলন
জেরুজালেম
তেহেরান
একবাটানা
সুসা
পার্সিপোলিস
ইরান
আফগানিস্থান
পেশোয়ার
সিন্ধু নং
ভারত
মেম্‌ফিস
মিশর
থিবস্‌
নীল নদ
লোহিত সাগর
আরব
পারস্য উপসাগর
আরব সাগর

রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁর সৈন্যরা ভারতবর্ষের সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত অধিকার করে। তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন। পারস্যে বেহিস্তান নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে পাহাড়ের গায়ে ডেরিয়াস দেশ বিজয়ের কথা তিনটি ভাষায় খোদাই করে রাখেন। লিপির উপর একটি ছবি আছে। তাতে দেখা যায় ডেরিয়াস বন্দীদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পায়ের কাছে একজন বন্দী পড়ে আছে। এই উৎকীর্ণ লিপি 'বেহিস্তান-লিপি' নামে খ্যাত। ডেরিয়াসের রাজত্বের শেষের দিকে গ্রীসের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ চলাকালীন ৪৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ডেরিয়াস মারা যান। তারপর তাঁর পুত্র জারক্সেস পারস্যের সিংহাসনে বসেন। জারক্সেসের সময়েও গ্রীসের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। এই যুদ্ধে

জারক্সেস



পারসীক সেনা



ডেরিয়াস ও বন্দীগণ

পারস্যের অনেক জাহাজ ও সৈন্য ধ্বংস হলেও পারসীক সাম্রাজ্যের শক্তি হ্রাস পায়নি। পারসীক সাম্রাজ্য অনেকদিন পর্যন্ত টিকে ছিল।

ইরানে প্রথমে অনেক দেব দেবীর পূজো করা হত। তাদের কোন কোন দেবতার সাথে আমাদের বৈদিক যুগের দেবতার মিল আছে। একজনকে বলা হত মিত্র। তাঁর সঙ্গে আমাদের সূর্যদেবের অনেক মিল আছে। এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে ইরানে একজন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম জরথুষ্ট্র। অবশ্য তাঁর সময়কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতপার্থক্য আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে। পারসীকদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে জরথুষ্ট্রের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সর্বদা ভাল মন্দ দুটো শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। কল্যাণ-শক্তির প্রভাবে শস্য জন্মাল, অকল্যাণের শক্তি তাকে নষ্ট করে দিল। কল্যাণ-শক্তির প্রভাবে হল প্রজা বৃদ্ধি, আর অকল্যাণের শক্তি আনল মহামারী। তাঁর মতে মঙ্গলময় দেবতার নাম অহুর-মজদা, আর অমঙ্গলের দেবতার নাম অহ্রিমান। মানুষ যদি সৎপথে থাকে, সদাচরণ করে, অন্যায় না করে, অসত্য না বলে, তাহলে অহুর-মজদার পূজো করা হবে, কল্যাণ শক্তির জয় হবে। আর মানুষ যদি অসৎ কাজ করে তবে অহ্রিমানের অকল্যাণ শক্তির বৃদ্ধি হবে। মৃত্যুর পরে পরলোকে প্রত্যেক মানুষের কাজের দোষগুণের বিচার হবে। জরথুষ্ট্র বলতেন যে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজো করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এক। জরথুষ্ট্র তাঁকেই বলতেন অহুর-মজদা।

জরথুষ্ট্র

জরথুষ্ট্রের মৃত্যুর পর তাঁর উপদেশ একটি গ্রন্থে সংগ্রহ করা হয়। এই গ্রন্থের নাম অবেস্তা। হিন্দুদের যেমন বেদ এবং খ্রীষ্টানদের যেমন বাইবেল, অবেস্তাও ইরানীদের সেইরকম ধর্মগ্রন্থ। অবেস্তায় জরথুষ্ট্রের উপদেশ ছাড়া অনেক স্তোত্র ও কাহিনী আছে। একটি উপদেশ আছে, মানুষের তিনটি কর্তব্য—শত্রুকে মিত্রে পরিণত করা, অসৎকে সৎপথে নিয়ে আসা এবং মুর্খকে জ্ঞান দেওয়া।

অবেস্তা

ইরানীরা অগ্নিকে খুব পবিত্র মনে করেন। তাঁদের ধর্ম মন্দিরে

সব সময় পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করে রাখা হয়। তাঁরা মাটি ও জলকে পবিত্র মনে করেন। অগ্নি বা মাটি অপবিত্র হবে বলে তাঁদের মৃতদেহ দাহ করা কিংবা কবর দেওয়া হয় না। মৃতদেহ একটি উঁচু স্তম্ভের উপর রেখে দেওয়া হয়। শকুনের দল অল্পক্ষণের মধ্যে মৃতদেহকে নিঃশেষ করে ফেলে।

প্রাচীন ইরানীদের বংশধরেরা কেউ কেউ ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের পার্শী বলা হয়। বোম্বাই অঞ্চলে অনেক পার্শীর বাস।

॥ চার ॥

ইহুদীদের কথা

অনেকদিন আগে ইহুদীরা মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায় বাস করত। তারা যাযাবর জাতি; পশুপালন করে তাদের জীবিকা চলত। এইজন্য তাদের এক দেশ থেকে অন্য দেশ ঘুরে বেড়াতে হত। তাদের একটি দল মিশরে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখানে বাস করতে থাকে। সেখানে প্রথমে তাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। এমনকি ফ্যারাওর অনুগ্রহে একজন ইহুদী প্রধান শাসনকর্তার পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে মিশরের লোকদের সাথে তাদের শত্রুতা আরম্ভ হল। তাদের জোর করে ক্রীতদাসের মত পিরামিড নির্মাণ, রাস্তা তৈরি প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজে লাগানো হত। এই দুর্গতির সময়ে ইহুদীদের মধ্যে একজন নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম মোজেস্। মোজেস্ ইহুদীদের সঙ্গে নিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে পূর্বদিকে চলে গেলেন। মিশরের ফ্যারাও তাদের পলায়নের খবর পেয়ে তাদের ধরতে সৈন্য পাঠান। কিন্তু মোজেস্ এবং তাঁর সঙ্গীরা পার হবার পরই লোহিত সাগরের জল বেড়ে গেল। সৈন্যরা তাদের ধরতে পারল না।

মোজেসের গল্প

অনেকদিন মিশরে থাকবার ফলে ইহুদীদের ধর্মাচরণ অনেকটা মিশরীয়দের মত হয়ে যায়। মোজেস্ তাদের মধ্যে এক দেবতার পূজো প্রচলন করলেন। এই দেবতার নাম জিহোবা। ইহুদীরা বিশ্বাস করতেন জিহোবার ইচ্ছায় ঝড় ও বজ্রপাত হয়।

জিহোবা

ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্রে আছে একদিন মোজেস্ দুই খণ্ড পাথর হাতে করে সিনাই পর্বতের উপরে উঠে গেলেন; তারপর ঝড় ও বজ্রপাত হতে লাগল এবং পর্বতের চূড়া মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। পরে মোজেস্ যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন তখন সেই পাথরের উপর দশটি উপদেশ লেখা হয়ে গিয়েছে। এইগুলিই ইহুদীদের ধর্মের মূল কথা। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—এক ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে পূজো করবে না; চুরি করবে না; মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না; নরহত্যা করবে না; পরের দ্রব্যে লোভ করবে না; পিতা মাতাকে সম্মান করবে।

মিশর থেকে আসবার পর ইহুদীরা অনেকদিন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল। মোজেসের আশা ছিল তিনি ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি।

রাজ্য প্রতিষ্ঠা

প্যালেস্টাইনের কাছে পৌঁছে মোজেসের মৃত্যু হয়। অবশেষে যুদ্ধ করে ইহুদিরা প্যালেস্টাইন দখল করে এবং ধীরে ধীরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইহুদীদের একজন রাজার নাম ডেভিড। তিনি খুব বীর ছিলেন। তখন রাজ্যের চারিদিকে ইহুদীদের অনেক শত্রু ছিল। তিনি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিস্তার করেন। ডেভিড একজন বড় কবিও ছিলেন। ডেভিডের পুত্র

ডেভিড ও সলোমন

সলোমন ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ রাজা। গুণী বলে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তিনি একজন বড় কবি। শোনা যায় তিনি এক হাজারের বেশী গান লেখেন। সলোমন বহু দূর দেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাতেন। ভারতবর্ষ থেকে তার জন্য হাতীর দাঁত, ময়ূর ও বানর চালান দেওয়া হত। ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য সলোমন একটি নৌবহর নির্মাণ

করেন। ব্যবসায় খুব লাভ হত, কাজেই সলোমনের ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না। একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক বলেছেন, সলোমনের সময় রাজ্যে এত রূপা ছিল যে পাথরের টুকরার চেয়ে তার কদর বেশী ছিল না। সলোমন অনেক টাকা খরচ করে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের অনেক জায়গায় সোনার আস্তরণ ও দেওয়ালে বহুমূল্য পাথরের কাজ ছিল। সলোমন নিজের বাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রাসাদ ও মন্দিরের এখন আর কোন চিহ্ন নেই। সলোমনের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তাঁর রাজ্য ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে যায়। একটির নাম হল ইসরাইল আর অপরটির নাম জুডা। জুডা রাজ্যের রাজধানীর নাম জেরুজালেম।

বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অংশে ইহুদীদের ধর্মের কথা আছে। তাঁরা অসহিষ্ণু ছিলেন, মূর্তিপূজো সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা এক ঈশ্বরের পূজোর কথা প্রচার করতেন। আজকাল পৃথিবীর অনেক জায়গায় ইহুদীরা ছড়িয়ে আছেন। চিত্রবিদ্যা, সংগীত ও বিজ্ঞানচর্চায় তাঁদের মধ্যে অনেক গুণী ব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা অন্য জাতি থেকে সর্বদা নিজেদের ধর্ম ও আচারের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন। বর্তমানে ইহুদীদের রাজ্যের নাম হল ইসরাইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

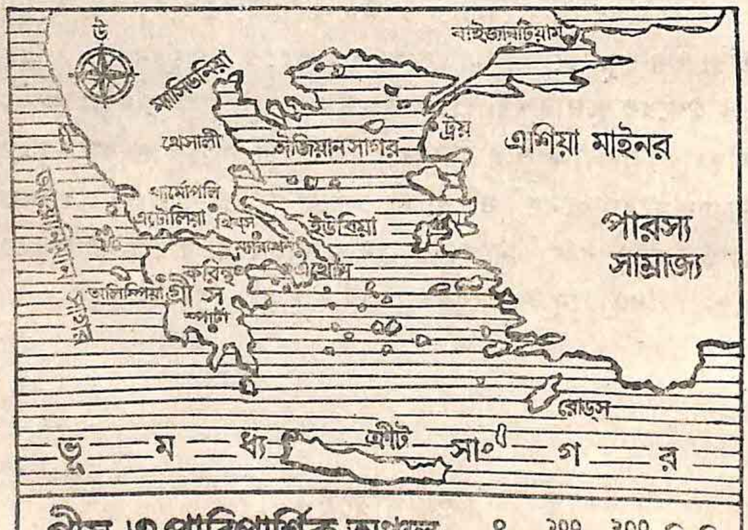
গ্রীস দেশ

গ্রীস দেশ হল উপদ্বীপ। তার তিন দিকে ভূমধ্যসাগর। দেশের কোন জায়গা থেকেই সমুদ্র বেশী দূরে নয়। প্রায় সমগ্র দেশটাই পাহাড়ে ভরা, মাঝে মাঝে উপত্যকা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ভাগ করা। তার ফলে গ্রীসে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল। গ্রীসের পূর্বে ঈজিয়ন সাগরের অসংখ্য দ্বীপমালা গ্রীস ও

এশিয়া-মাইনরের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে। সভ্যতার আদি-ভূমি পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে গ্রীকদের যোগাযোগ সহজেই গড়ে উঠেছিল।

ঈজিয়ন সভ্যতা

এই অঞ্চলে গ্রীকদের আসবার বহু পূর্বে ঈজিয়ন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতা খুবই উন্নত ধরনের ছিল। ক্রীট, ট্রয়, মাইকিনি ও টিরিন্‌স ছিল ঈজিয়ন সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। ক্রীট ছিল এই সভ্যতার আদি কেন্দ্র। ক্রীট দ্বীপে মাটি খুঁড়ে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে ঈজিয়ন সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সেকালে ভূমধ্য-সাগরের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে ক্রীট খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রীটের



গ্রীস ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চল

লোকেরা নগর নির্মাণ, নৌবিদ্যা, বাণিজ্য, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তারা লিখতে জানত। ক্রীটের রাজধানী ছিল নসস্‌। এখানে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মাইকিনি, ট্রয়, টিরিন্‌স প্রভৃতি স্থানে মাটি খুঁড়ে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। এই সব তথ্য থেকে ঈজিয়ন সভ্যতা কত বিস্তৃত ছিল

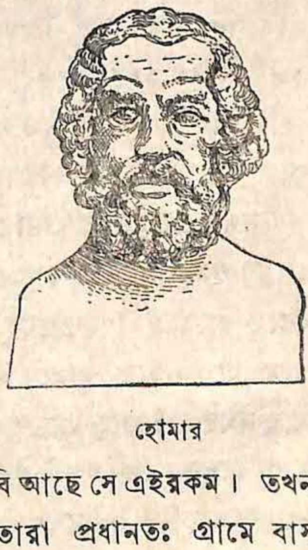
বোঝা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ সাল পর্যন্ত ঈজিয়ন সভ্যতার গৌরবময় যুগ। তারপর ঈজিয়নদের দুর্দিন আরম্ভ হল।

পরবর্তীকালে গ্রীকদের আধিপত্যের যুগ। গ্রীকরা আর্যজাতির একটি শাখা। তাদের আদি বাসস্থান ছিল বলকান উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। গ্রীকরা ঈজিয়ন অঞ্চলে আসার পর তাদের সঙ্গে ঈজিয়নদের যুদ্ধবিগ্রহ অনেককাল ধরে চলে। অবশেষে ঈজিয়নদের পরাজিত করে গ্রীকরা দেশে আধিপত্য স্থাপন করে। সভ্যতায় ঈজিয়নদের তুলনায় গ্রীকরা অনেক হীন ছিল। সুতরাং বিজয়ী হলেও গ্রীকরা ঈজিয়ন সভ্যতার কাছে ঋণী। স্বভাবতই গ্রীকদের উপর ঈজিয়ন সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল।

গ্রীক ইতিহাসের সূচনা

মহাকাব্যের যুগের সমাজ : গ্রীসের প্রথম যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালের যুদ্ধের কাহিনী ও যোদ্ধাদের কীর্তি নিয়ে অনেক গাথা রচিত হয়। ঈজিয়ন সাগরের শিয়স দ্বীপের অধিবাসী হোমার নামে একজন অন্ধ কবি প্রাচীন গ্রীসের যুদ্ধবিগ্রহের অনেক কাহিনী নিয়ে 'ইলিয়ড' ও 'ওডেসি' নামক দুখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ইলিয়ডের বিষয় ট্রয়ের যুদ্ধ, আর ওডেসির বিষয় হল ট্রয়ের পতনের পর রাজা ওডিসিয়সের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী। ওডিসিয়স ইথাকা নামে একটি ছোট রাজ্যের রাজা ছিলেন। এই দুই মহাকাব্য থেকে গ্রীক ইতিহাসের আদিযুগের অনেক কথা জানা যায়।

হোমারের মহাকাব্য



হোমার

হোমারের মহাকাব্যে সমাজের যে ছবি আছে সে এইরকম। তখন গ্রীকরা কৃষিকার্য ও পশুপালন করত। তারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস

করত। জনসাধারণ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : অভিজাত, সাধারণ মানুষ, থেটস ও ক্রীতদাস। অভিজাত শ্রেণী বড় বড় খামারের মালিক ছিল। ছোট ছোট জমির মালিকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। জমিহীন মানুষদের থেটস বলা হত, কিন্তু তারা দাস ছিল না। যুদ্ধবন্দীরাই ক্রীতদাস হত। জলদস্যুদের কাছ থেকেও ক্রীতদাস কিনে নেওয়া হত। ক্ষেতখামারে ও বাড়ীর কাজে ক্রীতদাসদের ব্যবহার করা হত। হোমারের যুগে রাজা দেশের শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বৈরাচারী হতে পারতেন না। তাঁকে আর দশজনের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হত। রাজ্য শাসনে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

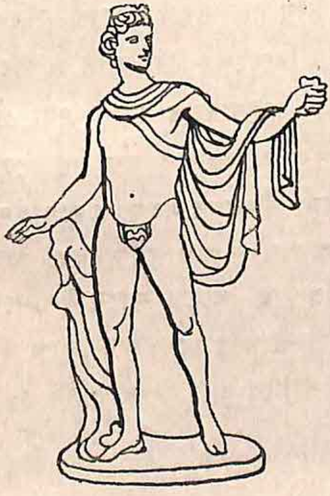
সমাজ জীবন

সমাজের কেন্দ্র ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তাই ছিলেন সর্বেসর্বা। সকলকেই তার হুকুম মেনে চলতে হত। জমি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; জমির মালিকানা ছিল পরিবারের। উচ্চ-নীচ সবাই শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল। মেয়েরা চরকা কাটত, তাঁত বুনত আর সেলাই করত। সমাজে মেয়েদের স্থান সম্মানের ছিল। গ্রীকদের প্রধান খাদ্য মাংস। তারা সুরাপান করত; ছাগলের দুধের দৈ তাদের প্রিয় ছিল। মৃত্যু হলে শব দাহ করা হত কিংবা কবর দেওয়া হত। দুরকম প্রথাই প্রচলিত ছিল। হোমারের কাব্যে বর্ণিত সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। তার ফলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জীবন দুর্বিসহ ছিল।

নগর-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা : হোমারের যুগের শেষের দিকে নগর-রাষ্ট্রের সূচনা হয়। গ্রীকরা গ্রাম ছেড়ে একটি স্থানে সমবেত হয়ে বাস করতে থাকে। এইভাবেই শহরের পত্তন হয়। রাজারা প্রজাদের গ্রাম থেকে শহরে আসতে উৎসাহ দিতেন। এক একটি শহরকে ঘিরে নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থান এমন ছিল যে গ্রীকদের পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। গ্রীস দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছোট ছোট রাষ্ট্রের পক্ষেই ছিল অনুকূল।

গ্রীক রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র ও অধিবাসীর সংখ্যা কম হওয়ায় নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ প্রসারিত হয় এবং গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিকশিত হয়। গ্রীসের রাজ্যগুলির মধ্যে এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ ও থিব্স প্রধান। গ্রীসে যখন ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হয় তখন স্পার্টা বাদে প্রতিটি রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন : গ্রীকদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ছিল। তাহলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন তাদের একজাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ রাখে। গ্রীকরা নিজেদের বলত 'হেলেনীজ' আর গ্রীক অধ্যুষিত দেশকে বলত 'হেলাস'। তারা মনে করত তাদের উৎপত্তির উৎস হল এক, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এক। তারা এক জাতি। তাদের মধ্যে এক ধর্মের বন্ধন।



এপোলো



এথেনা দেবী
(ফিডিয়াস নির্মিত মূর্তির অনুকরণে)

গ্রীকরা নির্দিষ্ট দিনে এক জায়গায় উপস্থিত হয়ে একই দেবতার উপাসনা করত ও উৎসব করত। তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের দেবদেবীরা অলিম্পাস পর্বতে বাস করেন। দেবতাদের রাজা ছিলেন

জিউস। এথেনা তাঁর কন্যা, এপোলো তাঁর পুত্র। এথেনা হলেন জ্ঞান ও যুদ্ধের দেবী। তিনি এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর নামেই এথেন্স নগরীর নামকরণ হয়। এপোলো হলেন সূর্যের দেবতা, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় পারদর্শী এবং ত্রিকালজ্ঞ। নিজেদের ভবিষ্যৎ জানবার জন্য গ্রীকরা ডেলফি নগরে এপোলোর মন্দিরে যেত। এইসব অনুষ্ঠান ও উৎসব গ্রীকদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করে। গ্রীকরা হোমারের কাব্যকে তাদের জাতীয় সাহিত্য বলে মনে করত। অলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবেও গ্রীকদের জাতীয় ঐক্যের মনোভাব ব্যক্ত হয়। এইভাবে বিভিন্ন গ্রীক রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মার বন্ধন গড়ে ওঠে।

উপনিবেশ স্থাপন ঃ খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকেই গ্রীস দেশের বাইরে গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। গ্রীসের আবহাওয়া খুব বেশী ঠাণ্ডা কিংবা বেশী গরম না থাকায় এখানকার অধিবাসীরা স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী ছিল। ভূমি সর্বত্র সমান উর্বর না হওয়ায় তাদের কৃষিকর্মে অনেক পরিশ্রম করতে হত। সুতরাং বিদেশের উর্বর জমি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধায় তারা প্রলুব্ধ হয়। জনসংখ্যার চাপ এবং গ্রীক রাষ্ট্রদের মধ্যে বিরোধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বহু লোক বিদেশে যেতে আরম্ভ করেন। তাছাড়া গ্রীকদের সহজাত দুঃসাহস ও দেশ ভ্রমণের আকর্ষণ থাকায় তারা অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেয়। তারা এশিয়া-মাইনর, ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের মনোভাব জেগে ওঠে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির ফলে সাগরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এথেন্স

এথেন্সের লোকদের বাড়িঘর খুব সাধারণ ছিল। বাড়িগুলি প্রায়ই একতলা। একটি উঠান ও তার চারদিক ঘিরে কয়েকটি ঘর। ঘরে অনেক সময় জানালা থাকত না ; আসবাবপত্রও খুব কম থাকত।

তাদের পোশাকও খুব সাধারণ ছিল। তারা বেশীর ভাগ সময় সাদা রঙের কাপড় পরত।

লেখাপড়া শেখার বয়স হলে ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হত; সেখানে লেখাপড়া ছাড়া গান, ছবি-আঁকা ও শরীর-চর্চা শেখান হত। এই শিক্ষা শেষ হলে সীমান্তের কোন দুর্গে কিছুদিন সৈন্যের কাজ করতে হত, তারপর এথেন্সের যুবকরা দেশে ফিরে এলে নাগরিক বলে গণ্য হত। তারা যাতে ভাল নাগরিক হতে পারে শিক্ষার সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত।

বিদ্যাচর্চা

এথেন্সে অনেক বিদেশী পণ্ডিত থাকতেন। যারা আরও বেশী লেখাপড়ার চর্চা করতে চাইত তারা অনেক সময় তাঁদের কাছে পড়ত। কিন্তু এইসব শিক্ষকদের অনেক টাকা দিতে হত, কাজেই গরীবদের সে সুযোগ হত না।

এথেন্সের মেয়েদের লেখাপড়া করবার সুবিধা ছিল না। তাদের জন্য আলাদা কোন বিদ্যালয় ছিল না। তাদের বাড়ীতে পড়তে হত। অল্প লেখাপড়ার সঙ্গে তাঁত বোনা, সেলাই, ছুঁচের কাজ প্রভৃতি শেখানো হত। তারা গান ও বীনাবাদন প্রভৃতি শিখত।

এথেন্সের নাগরিকদের দৈনন্দিন কাজে বেশী সময় লাগত না। যে সব কাজে বেশী পরিশ্রম কিংবা বেশী সময় দরকার হত সেই সব কাজের জন্য ক্রীতদাস থাকত। ক্রীতদাসরা ঘর সংসারের কাজ করত এবং জমি চাষ করত। কখনও কখনও ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার ভারও তাদের উপর থাকত। সুতরাং নাগরিকদের অবসরের অভাব হত না। তারা বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে কাটাত। তারা অনেক সময় রাজপথে কিংবা বাজারে একত্র হয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করত। অপরাহ্নে শাসন পরিষদের অধিবেশন হত। অনেকে সেখানে যোগ দিত কিংবা আদালতে বিচার শুনত।

নাগরিক জীবন

প্রথম দিকে এথেন্সে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। তারপরে অভিজাত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৪ সালে সোলন নামে একজন পণ্ডিত

শাসনবিধির ও সামাজিক সংস্কারের সাধন করে, এথেন্সে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাধারণ চাষী, শ্রমিক ও গরীব কারিগরদের রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছিলেন। সোলনের বিধানের ফলে দেনার দায়ে আর কেউ ক্রীতদাস হত না তাঁর সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের মনে আশা ও উদ্দীপনা দেখা দিল।

শাসনতন্ত্র

স্পার্টা

এথেন্সের তুলনায় স্পার্টায় কড়াকড়ি অনেক বেশী ছিল। লাইকারগাস নামে স্পার্টায় একজন আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্পার্টার আইন প্রণেতা ছিলেন। তাঁকেই স্পার্টার সমাজ-ব্যবস্থার জনক বলা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অল্প বয়সেই ছোট ছেলেদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা গ্রীকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৈনিক হতে পারে। যেসব শিশুদের স্বাস্থ্য খুব খারাপ তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা হত না, পাহাড়ের উপর ফেলে রাখা হত। তাতে যারা বেশী দুর্বল তাদের বাঁচবার কোনও আশাই থাকত না। সাত বছর বয়স হলে শিশুদের মা বাবার কাছ থেকে নিয়ে আসা হত। রাষ্ট্র তাদের মানুষ করবার ব্যবস্থা করতেন। ত্রিশ বছর না হলে তারা বাড়ি ফিরতে পারত না। তাদের শিক্ষার ভার রাষ্ট্রের হাতে থাকত। লেখাপড়ার দিকে যে খুব ঝোঁক দেওয়া হত তা নয়, কিন্তু তাদের শরীর যাতে শক্ত হয় তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হত। তাদের কোনরকম বিলাসিতা করতে দেওয়া হত না। তাদের নানা রকম শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে শেখানো হত। এর ফলে স্পার্টার মত সুশিক্ষিত সৈন্য গ্রীসে আর ছিল না।

শিক্ষা পদ্ধতি

স্পার্টায় রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুজন রাজা একসঙ্গে রাজত্ব করতেন। রাজাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ সংসদ ও সমিতি নামে দুটি সংস্থার সমাজ-পতিদের হাতে অনেক ক্ষমতা ছিল। নাগরিকরাও অনেক অধিকার ভোগ করতেন।

রাজতন্ত্র

স্পার্টার একশ্রেণীর লোকদের 'হেলট' বলা হত। তাদের কোন অধিকার ছিল না। তারা ছিল ভূমিদাস, জমিজমা চাষ করত। স্বাধীন নাগরিকরা হেলটদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করত। হেলটরা অনেক সময় বিদ্রোহ করত। নাগরিকরা সন্দেহ হলে হেলটকে হত্যা করতে পারত।

হেলট

স্পার্টার জীবন যাত্রা ছিল সরল। বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হত না। প্রত্যেক নাগরিককে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। ছেলেদের মত মেয়েরাও শরীর চর্চা করত। সুস্থ সবল সৈনিক পুত্রের জননী হওয়া তাদের কামনা ছিল। রাষ্ট্রের সেবা ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা এই দুই লক্ষ্য সামনে রেখেই নাগরিকদের তৈরি করা হত।

স্পার্টা ও এথেন্সের তুলনা: এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। বলা হত স্পার্টার লাইকারগাস সৈনিক তৈরি করেন আর এথেন্সের সোলন সৎ নাগরিক তৈরি করেন। স্পার্টায় কেবল শরীরের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হত, মানসিক উন্নতির চেষ্টা ছিল না। এথেন্সের অধিবাসীরা ছিলেন উদার-চিন্তার অধিকারী। গ্রীসের বিখ্যাত লেখক ও শিল্পীরা প্রায় সবাই ছিলেন এথেন্সের লোক। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। গ্রীসের প্রাধান্য স্থাপনের ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।

এথেন্সে শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ: ৪৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের রাজনীতিতে পেরিক্লিস নামে একজন জননায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রায় ত্রিশ বছর তিনি ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক। তিনি গণতান্ত্রিক দলের নেতা হয়েও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এথেন্সকে সমগ্র গ্রীসের শীর্ষস্থানীয় করা। তাঁর নেতৃত্বে এথেন্সের শক্তি ও সমৃদ্ধি চরমে ওঠে। জলে স্থলে তার সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হয়। তার সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক প্রগতি এথেন্সের গৌরব বৃদ্ধি করে।

পেরিক্লিস

পেরিক্লিস শুধু যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তা নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি এথেন্সকে গ্রীস দেশের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর শহর করে গড়বেন। এথেন্স হবে সমগ্র গ্রীসের শিক্ষয়িত্রী—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি একজন বক্তা হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন। ৪২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। এই সময়ের মধ্যে এথেন্সে বিখ্যাত শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের আবির্ভাব হয়। গ্রীসের ইতিহাসে এই সময়কে 'পেরিক্লিসের যুগ' বলা হয়।



পেরিক্লিস

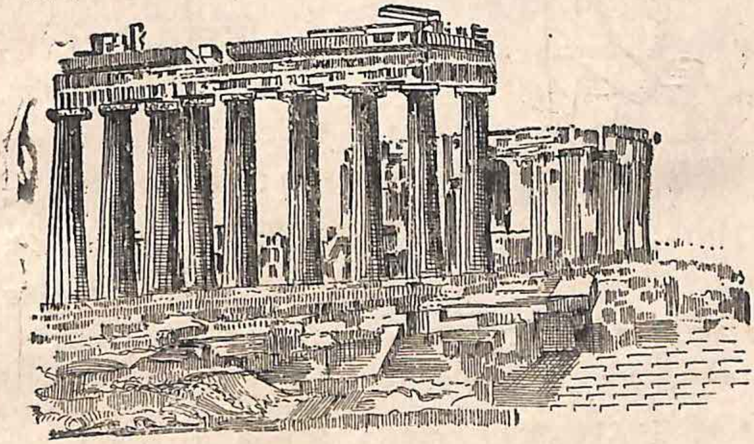
গ্রীসের দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি দেখতে কুৎসিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত লোক সে যুগে আর ছিল না। সক্রেটিসের বাবা সক্রেটিস পাথরের কাজ করতেন। প্রথম জীবনে সক্রেটিসও এই জীবিকা গ্রহণ করেন। সক্রেটিস কয়েকটি যুদ্ধে পদাতিক সৈন্যরূপেও যোগদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন এথেন্সের উদীয়মান তরুণদের শিক্ষাগুরু। তিনি পথে পথে ঘুরে তরুণদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন ও উপদেশ দিতেন। তিনি মনে করতেন এই সব আলোচনার ফলে



সক্রেটিস

সাধারণ লোক সত্য পথ ও সত্য ধর্মকে চিনতে পারবে। তিনি বলতেন, মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয় বিচার করতে হবে। বিবেক যা মানতে চায় না কারও নির্দেশে তা মেনে নেওয়া উচিত নয়। শাসকরা সক্রেটিসের চিন্তার মধ্যে বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়েছিলেন। তিনি যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন, এই অভিযোগে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। বিচারকের আদেশে তিনি বিষপান করে মৃত্যু বরণ করেন।

সক্রেটিসের একজন শিষ্যের নাম প্লেটো। তিনি সক্রেটিসের মতামত গ্রন্থে লিখে রাখেন। প্লেটো নিজেও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যারিস্টটল তাঁর ছাত্র ছিলেন। অ্যারিস্টটল আবার বীর আলেকজাণ্ডারের গুরু।



পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ

এথেন্সের একটি বিখ্যাত মন্দিরের নাম পার্থেনন। মন্দিরটি এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার নামে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরের অনেক কাজ শিল্পী ফিডিয়াস ও তাঁর শিষ্যদের হাতে করা। এথেনার মূর্তিটি ফিডিয়াসের তৈরি।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

শিল্পীরা পার্থেননের গায়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন তৈরি করেন। এথেন্সের গিরি-দুর্গ অ্যাক্রপলিসের পরিকল্পনা করেন বিখ্যাত স্থপতি ইকটিনস।

গ্রীকরা অভিনয় দেখতে খুব ভালবাসত। গ্রীক নাটকের উৎপত্তি হয়েছে ডায়োনিসিয়সের উৎসব হতে। ডায়োনিসিয়স ছিলেন সুরার দেবতা। গ্রীকরা অভিনয় করত উন্মুক্ত আকাশের নীচে; দর্শকরা কাঠের আসনে বসতেন। তাদের অভিনয় অনেকটা আমাদের দেশের যাত্রার মত ছিল। পরে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও তাকে ঘিরে পাথরের তৈরি আসন নির্মিত হয়। গ্রীক নাট্যশালা পেরিক্লিসের আমলকে মহিমান্বিত করে তোলে। এথেন্সে কয়েকজন খুব বড় নাট্যকারও ছিলেন। তাঁদের নাম ঈসকাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস। তাঁরা তিনজন প্রায় এক সময়ের লোক। তাঁরা ট্রয়ের যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনী এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে অনেক নাটক রচনা করেন। আর একজনের নাম এরিস্টোফেনিস। তিনি কিছু পরের লোক। তাঁর অনেক নাটকে রাজনৈতিক জীবনের ছায়া পাওয়া যায়। তাঁদের নাটক অনেক লোকের সামনে হত। তাঁদের রচনার ফলে গ্রীক সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে।

সাহিত্য



সফোক্লিস

একজন বড় ঐতিহাসিকের নাম হেরোডোটাস। তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। পারসীক-গ্রীক যুদ্ধ তাঁর গ্রন্থের মূল



হেরোডোটাস

বিষয়। তাঁর গ্রন্থে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথাও পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের কথাও আছে। হেরোডোটাস কিন্তু এথেন্সের লোক ছিলেন না। এশিয়া-মাইনরের হেলিকারনেসাস নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ম্যাসিডন

পারসীকদের সাথে যুদ্ধজয়ের পরে এথেন্স খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধের ফলে এথেন্সের ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গেল। গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডন রাজ্য। ৩৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফিলিপ ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসেন। রাজা ফিলিপ অনেক দেশ জয় করবেন বলে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। ম্যাসিডনের সৈন্যদের বাধা দিতে পারে তখন গ্রীসে এমন কোন রাজ্য ছিল না। ফিলিপ সহজেই সমগ্র গ্রীস জয় করলেন। গ্রীকরা তাঁর ক্ষমতা দেখে তাকে নেতা বলে মেনে নেয়। কিন্তু ফিলিপের দেশ জয় করবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। দিগ্বিজয়ে বের হবার পূর্বেই ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

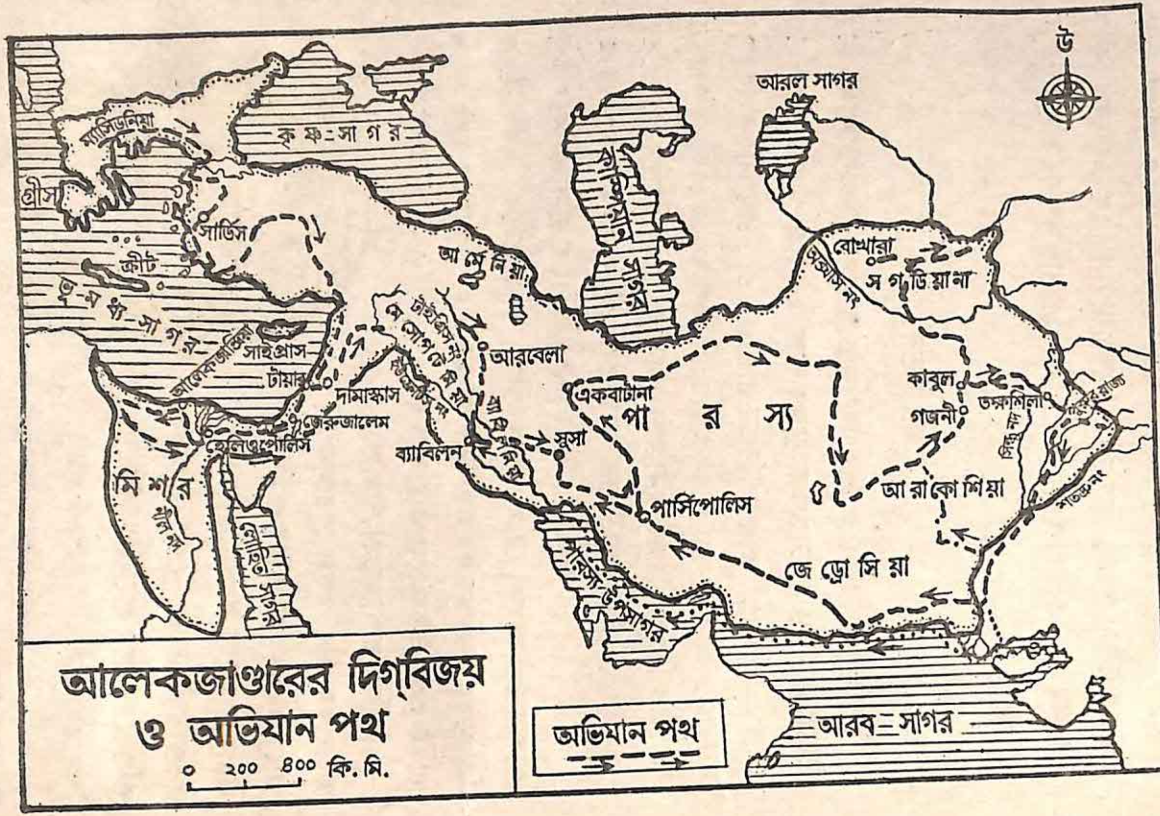
ফিলিপ



আলেকজাণ্ডার

ফিলিপের আকাঙ্ক্ষা তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার সফল করলেন। আলেকজাণ্ডারের শরীর ও মনের উন্নতির জন্য ফিলিপ অনেক চেষ্টা করতেন। নানা দেশ থেকে পণ্ডিতদের এনে আলেকজাণ্ডারের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন অ্যারিস্টটল। তাঁর শিক্ষার ফলে গ্রীক সাহিত্যের প্রতি আলেকজাণ্ডারের খুব অনুরাগ জন্মে। ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি

আলেকজাণ্ডার



আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয় ও অভিযান পথ

০ ২০০ ৪০০ কি. মি.

যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। এই বয়সেই আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বের হলেন। তাঁর সুগঠিত দেহ ও সোনালী চুল দেখে তাঁকে গ্রীক দেবতা বলে মনে হত। তিনি ত্রিশ হাজার পদাতিক ও পঁয়ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। তখন পারস্যের সম্রাট ছিলেন তৃতীয় ডেরিয়াস। আলেকজাণ্ডার পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করে এশিয়া-মাইনর অধিকার করেন। তারপর তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর জয় করেন। মিশরে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নামে নগর স্থাপন করেন। ব্যাবিলন ও সুসা শহর দখল করার পর আলেকজাণ্ডার পারস্যের রাজধানী পার্সিপোলিস অধিকার করলেন।

পারস্য ও মিশর জয়

এইবার আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ সেই সময় পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। এই অঞ্চল তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। কোন কোন রাজ্যে রাজা শাসন করতেন। কোথাও আবার কোন রাজা ছিল না, দেশের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি মিলিত হয়ে শাসন চালাতেন। ছোট ছোট রাজাদের আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ছিল না। তা হলেও কোন কোন রাজ্যে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের আনুগত্য স্বীকার করলেন। কিন্তু অম্ভির প্রতিবেশী রাজা পুরু বিদেশীর নিকট মাথা নত করলেন না। ঝিলাম নদীর তীরে পুরুর সেনাদলের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলেকজাণ্ডার জয়ী হলেন; পুরু বন্দী হলেন। পুরুর অসম সাহস ও তেজস্বিতা দেখে আলেকজাণ্ডার মুগ্ধ হন। তিনি পুরুকে প্রশ্ন করেন—'আমার কাছে আপনি কি রকম ব্যবহার আশা করেন?' উত্তরে পুরু বলেন—'রাজার মত ব্যবহার আশা করি।' আলেকজাণ্ডার সন্তুষ্ট হয়ে পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

ভারত আক্রমণ

পুরু ও আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডারের মগধ আক্রমণ করবারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা দেশে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। উপায় না দেখে আলেকজাণ্ডার ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তিনি আর স্বদেশে ফিরে যেতে পারেননি। পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। ফিরবার পথে ব্যাবিলনে কয়েকদিনের অসুস্থতার পর ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে রোমানরা গ্রীসে আধিপত্য স্থাপন করে। গ্রীকরা রোমানদের নিকট পরাজিত হলেও, রোমের উপর গ্রীক সাহিত্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোম

এখন থেকে আড়াই হাজার বছরের কিছু পূর্বে ইটালিতে রোম শহরের পত্তন হয়। এখানকার লোকেরা যে ভাষায় কথা বলত তাকে ল্যাটিন ভাষা বলে। আমাদের দেশে যেমন সংস্কৃত সেই রকম ইউরোপে ল্যাটিন ভাষা থেকে অনেক ভাষার জন্ম হয়েছে।

রোমের প্রাচীন কাহিনীতে আছে, রোমিউলাস ও তাঁর ভাই রেমাস এক রাজবংশের সন্তান ছিলেন। তাঁদের মাতামহের রাজা হবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই তাঁর রাজত্ব কেড়ে নেন এবং ভবিষ্যতে যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় সেজন্য তাঁর ছেলেদেরও মেরে ফেলেন; বাকি রইল শুধু একটি মেয়ে। এই মেয়ের যমজ পুত্র হলেন রোমিউলাস ও রেমাস। রাজা টের পেয়ে তাদের নদীর জলে ফেলে দিতে

প্রাচীন উপাখ্যান: রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা

হুকুম দেন। রাজার চাকর মনে করল নদীর কিনারায় ঝুড়িশুদ্ধ ছেলে দুটিকে রেখে গেলেই জোয়ারের জলে ভেসে যাবে। কিন্তু নদীতে ভাটা এলো। তাদের কান্না শুনে একটি বাঘিনীর দয়া হল। বাঘিনীর দুধ খেয়ে শিশুরা বড় হল। তারপর এক চাষী ছেলে দুজনকে বাড়ি নিয়ে গেল। চাষীর ঘরে রাজার নাতিরা মানুষ হতে লাগল। বড় হয়ে তাঁরা টাইবার নদীর তীরে পাহাড়ের উপরে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করলেন। কার নামে শহরের নাম হবে, এই নিয়ে দু ভাইয়ের মধ্যে লড়াই হল। রেমাস মারা গেলেন। তখন রোমিউলাসের নামে শহরের নাম হল রোম। রোমিউলাস রোমের প্রথম রাজা। তারপর তাঁর বংশের কয়েকজন রাজা রোমে রাজত্ব করেন। শেষ রাজার অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে দেশের লোকেরা তাঁকে তাড়িয়ে দিল। তখন থেকে রোমে প্রজাতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হল।

রোম ধীরে ধীরে চারিপাশের অন্যান্য দেশ জয় করে বড় হয়ে উঠল। ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার হতে লাগল। তখন আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ শহরের খুব প্রতাপ। রোম বড় হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে রোম ও কার্থেজের মধ্যে বিবাদ বেধে গেল।

রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ

কার্থেজ ছিল ফিনিশীয়দের একটি উপনিবেশ। এখন থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনিশীয়দের বাস ছিল। ভূমধ্যসাগরের চারিদিকের রাজ্যগুলি এবং আরও অনেক দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ফিনিশীয়দের মত দক্ষ নাবিক এবং চতুর ব্যবসায়ী সে যুগে আর ছিল না। ফিনিশীয়দের প্রধান নগরের নাম টায়ার। গ্রীস, ইটালি, স্পেন, আফ্রিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাদের জাহাজ প্রায়ই যাতায়াত করত। ভূমধ্যসাগরের তীরে তারা অনেকগুলো শহরও প্রতিষ্ঠা করে। কার্থেজ মার্সাই, সাইপ্রাস দ্বীপ প্রভৃতি জায়গায় তাদের

ফিনিশীয় বণিক

ঘাটি ছিল। কার্থেজের প্রাধান্য উত্তর আফ্রিকার বৃহত্তর অঞ্চলে স্থাপিত হয়। সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা তার দখলে ছিল; সিসিলির বৃহত্তর অংশেও কার্থেজের কর্তৃত্ব ছিল।

৮২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফিনিশীয়রা কার্থেজে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করে। পরে সমৃদ্ধি ও সম্পদে কার্থেজ অন্য সব নগরকে ছাড়িয়ে যায়। প্রাচীন ঐতিহাসিকরা কার্থেজ শহরের বর্ণনা করেছেন। শহরের মধ্যে আড়াই লক্ষ লোকের বাস, বন্দরে বহু দেশের জাহাজ, উঁচু মন্দির ও প্রাসাদের শিখর দূর থেকে চোখে পড়ত। সংকীর্ণ পথের দুই ধারের দোকানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের জিনিস পাওয়া যেত। শহরের দক্ষিণে যেদিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করার ভয় ছিল সেদিকে তিনটি উঁচু প্রাচীর। শহর রক্ষার জন্য পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য বাহিনী ছিল। কার্থেজের সৈন্যরা হাতীতে চড়েও যুদ্ধ করত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে কার্থেজের তুলনা ছিল না।

কার্থেজ

রোমানরা ফিনিশীয়দের 'পিউনিকাম' বলত, সেইজন্য কার্থেজের সঙ্গে রোমের যে যুদ্ধ হয় তাকে 'পিউনিক যুদ্ধ' বলে। প্রথম পিউনিক যুদ্ধে (২৬৪-২৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কার্থেজের পরাজয় হল। তার ফলে কার্থেজকে সিসিলি দ্বীপ রোমের হাতে ছেড়ে দিতে হল ও অনেক ক্ষতিপূরণ দেবার অঙ্গীকার করতে হল। এই যুদ্ধে কার্থেজের খুব ক্ষতি হল। কিন্তু হামিলকার বার্কা নামে কার্থেজের এক সেনাপতি স্পেনের এক অংশ জয় করে সেখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। স্পেন দেশের দক্ষিণে সোনা ও রূপার খনি ছিল। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই কার্থেজের অবস্থা আবার ভাল হয়ে উঠল। হামিলকার বার্কার মৃত্যু হলে সৈন্যরা তাঁর পুত্র হানিবলকে তাদের নেতা বলে মেনে নিল। হামিলকার কখনও কার্থেজের পরাজয়ের কথা ভুলতে পারেননি। হানিবলের বয়স যখন মাত্র নয় বছর, তখন তিনি তাঁকে দেবমন্দিরে নিয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করান যে,

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ

হামিলকার বার্কা

হানিবল এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। হানিবল এই অঙ্গীকারের কথা চিরদিন মনে রেখেছিলেন।



হানিবল

স্পেনের পূর্ব সীমান্তে সেগানটাম নামে একটি শহর ছিল। এই শহরের অধিবাসীরা রোমানদের বন্ধু ছিলেন। হানিবল এই শহর আক্রমণ করলেন। রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ

একে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ (২১৮-২০২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) বলে। হানিবল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুর্গম আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইটালিতে প্রবেশ করলেন। 'কানে'র যুদ্ধে রোমানরা তাঁর নিকট পরাজিত হল। এই যুদ্ধে অনেক রোমান সৈন্য নিহত হয়। হানিবলের সৈন্য কম থাকায় তিনি রোম আক্রমণ করতে অগ্রসর হননি। অবশেষে হানিবলের ভাই হাসড্রুবাল সৈন্য নিয়ে আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইটালিতে

হাসড্রুবাল

পৌছান। রোমানরা বুঝতে পারে যে, হানিবলের সঙ্গে হাসড্রুবাল মিলিত হলে কার্থেজের সৈন্যদের আর বাধা দেওয়া যাবে না। তাই তারা পূর্বেই হাসড্রুবালকে আক্রমণ করে হারিয়ে দেয়। যুদ্ধে হাসড্রুবালের মৃত্যু হল। এই সঙ্গে হানিবলের রোম জয়ের আশা শেষ হয়ে গেল।

রোমানদের মনে হয়েছিল, হানিবলের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হল কার্থেজ আক্রমণ করা। তা হলে হানিবলকে নিজ দেশ

জামার যুদ্ধ

রক্ষা করবার জন্য ইটালি ছেড়ে চলে যেতে হবে। রোমান সেনাপতি সিপিও সমুদ্র পার হয়ে কার্থেজ আক্রমণ করলেন। কার্থেজ রক্ষা করবার জন্য হানিবলের ডাক

পড়ল। রোম বিজয় অসমাপ্ত রেখে হানিবল দেশে ফিরে গেলেন। কার্থেজের কাছে জামা নামক স্থানে হানিবলের সঙ্গে সিপিওর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হানিবল হেরে গেলেন। এই তাঁর জীবনের একমাত্র পরাজয়। তাঁর পরাজয়ে কার্থেজের সর্বনাশ হল। স্পেনের রাজ্য ও ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলি রোম অধিকার করে নিল। কার্থেজের অধিবাসীরা প্রতি বছর রোমকে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করল। রোমান সৈন্যরা কার্থেজের প্রায় পাঁচশত যুদ্ধ জাহাজ পুড়িয়ে দিল।

রোমানদের মন থেকে কিন্তু হানিবলের ভয় দূর হয়নি। পরাজয়ের পর হানিবল দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। রোমের সৈন্যরা তাঁকে দেশ হতে দেশান্তরে তাড়া করে ফিরেছিল। অবশেষে বৃদ্ধ হানিবল বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, "রোমানদের এত ভয়, তারা আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না।"

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ

রোমের সঙ্গে কার্থেজের সন্ধি পঞ্চাশ বছরের বেশী স্থায়ী হয়। তারপর আবার যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধকে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ (১৪৯-১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বলে। কেটো নামে রোমের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন। তিনি একবার কার্থেজে যান। ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বেকার মত চলছে এবং কার্থেজের আবার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর মনে হল, ভবিষ্যতে রোমের আবার বিপদ হতে পারে। রোমে ফিরে তিনি সকলকে কার্থেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি যে বিষয়েই রোমের সেনেটে বক্তৃতা দিতেন তার শেষে বলতেন, "কার্থেজকে ধ্বংস করতে হবে।" অবশেষে সন্ধির সর্ত পালন করা হচ্ছে না এই কারণ দেখিয়ে রোমানরা কার্থেজ আক্রমণ করে। চার বছর

কার্থেজের ধ্বংস

অবরোধের পর তারা কার্থেজ অধিকার করে ধ্বংস করে ফেলল। আসিরীয়রা পরাজিত শত্রুর প্রতি যে রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করত রোমানরাও তাই করল। কার্থেজ

শহর প্রথমে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হল, তারপর লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে ফেলা হল। কার্থেজ শহরের কোন চিহ্ন রইল না।

রোমান সমাজ ব্যবস্থা : রোমান রাষ্ট্রের ভিত্তি পরিবার। পরিবারে পিতাই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। পরিবারের ক্রীতদাস ও সন্তানদের উপর পিতার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তারই নির্দেশে পরিবার চলত। প্রাচীনকাল থেকে রোমের জনসাধারণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা প্যাট্রিসিয়ান এবং গরীব বা সাধারণ মানুষেরা প্লিবিয়ান নামে পরিচিত ছিল। প্যাট্রিসিয়ানরা অনেক সুবিধা পেত আর প্লিবিয়ানরা ছিল বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্লিবিয়ানরা যোগ দিতে পারত না; প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে প্লিবিয়ানদের বিবাহ সম্ভব ছিল না। প্লিবিয়ানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। প্যাট্রিসিয়ানরাই কনসাল, ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চপদস্থ পুরোহিত হত। রাজতন্ত্রের অবসানের পর রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে দুজন কনসাল দেশ শাসন করতেন। প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্য থেকে প্রতি বছর দুজন কনসাল নির্বাচিত হতেন। কনসালদের পরামর্শ দেবার জন্য ছিল সেনেট। সেনেট ছিল অভিজাতদের সভা। প্লিবিয়ানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি নতুন পদের সৃষ্টি হয়। তাকে ট্রিবিউন বলা হত। প্রতি বছর দুজন ট্রিবিউন নির্বাচন করা হত।

শ্রেণীবিভাগ

প্রথমে রোমের প্রত্যেক নাগরিকদের শাসন সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার ছিল না। সে অধিকার ভোগ করত কেবল অভিজাতশ্রেণী। পরবর্তীকালে অবশ্য ট্রিবিউনরা প্লিবিয়ানদের পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করতে সাহায্য করে। সুতরাং প্রথম দিকে প্যাট্রিসিয়ানরা পূর্ণ নাগরিকের অধিকার ভোগ করলেও পরে প্লিবিয়ানরাও নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে। রোমের সাম্রাজ্য সমগ্র ইটালিতে ও তার বাইরে বিস্তৃত হবার পরে রোমের নাগরিকত্ব ইটালীয়ান বা অন্য অধিবাসীদের

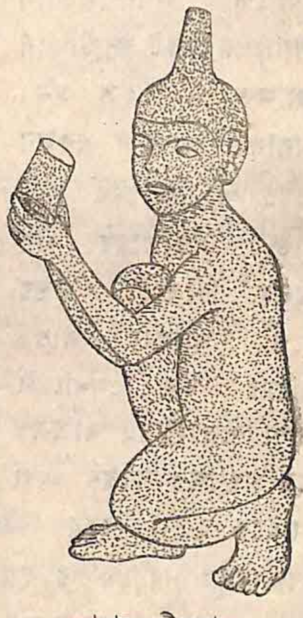
রোমের নাগরিক

দেওয়া হয়নি। যারা রোমের নাগরিক তাদের জন্য এক আইন, আর যারা বিদেশী বা অধীন দেশের লোক তাদের জন্য অন্য আইন ছিল।

রোমের সমাজে ক্রীতদাসের কোন অধিকার ছিল না। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমান সমাজে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ক্রীতদাস

যুদ্ধে বন্দী ও বিভিন্ন স্থান থেকে জোর করে ধরে আনা লোকদের ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করা হত। এই সব ক্রীতদাসদের চাষবাস, ঘরের কাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদিতে নিয়োগ করা হত। তাদের উপর অত্যাচারও করা হত। তাই মাঝে মাঝে ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ করত। কিন্তু তারা সঙ্ঘবদ্ধ না থাকায় রোমান সৈন্যরা সহজেই এই সব খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ দমন করত। তখন বিদ্রোহীদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহারের কোন সীমা থাকত না।


রোমান ক্রীতদাস

প্রাচীনকালে রোমের নাগরিকদের আনন্দদানের জন্য মল্ল যুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল। মল্লযোদ্ধারা ছিল বন্দী ক্রীতদাস। তাদের নিজেদের হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করে লোককে আনন্দ দিতে হত। তার ফলে তারা অনেকে মারা যেত। মল্লযুদ্ধে যাতে ক্রীতদাসরা দক্ষ হতে পারে তার জন্য রোমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কাপুয়া নামক স্থানে। সেখানে থ্রেসের অধিবাসী

স্পার্টাকাস

স্পার্টাকাস নামে একজন মল্লযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কাপুয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মল্লযোদ্ধারা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে ৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিদ্রোহ করে। তাদের

সঙ্গে অনেক পলাতক ক্রীতদাস যোগ দেয়। রোমের শাসনের বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন স্পার্টাকাস। দুবছর স্পার্টাকাস দক্ষিণ ইটালিতে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখেন। তিনি ৭২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমের একজন প্রেটর ও দুজন কনসালকে পরাজিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিসিনিয়াস ক্রাসাসের নিকট স্পার্টাকাস পরাজিত ও নিহত হন। ক্রাসাস ছিলেন একজন প্রেটর ও রোমের ধনী ব্যক্তি। পরাজয়ের পর অনেক বিদ্রোহী উত্তর দিকে পালিয়ে যায়। রোমের দক্ষ জেনারেল পম্পে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে পরাজিত করেন এবং



স্পার্টাকাস

সবাইকে হত্যা করেন। এই বিদ্রোহ দমনের পর ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হয়। পম্পে ও ক্রাসাস নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নেন এবং দুজনে ৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কনসাল হন।

জুলিয়াস সীজার: জুলিয়াস সীজার এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন দক্ষ সৈনিক, পণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন। উদার স্বভাবের জন্য তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রেটর থাকাকালীন তিনি স্পেনে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু রোমের সেনেট তাঁর সাফল্যের কোন স্বীকৃতি দিতে চায়নি।

তখন থেকে সীজার সেনেটের ক্ষমতা হ্রাসে উদ্যোগী হন। সীজার ৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কনসাল হন।



জুলিয়াস সীজার

সীজার গল রাজ্য দখল করেন। তিনি রাইন নদী অতিক্রম করে জার্মানীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে ব্রিটেন আক্রমণ করে দখল করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে ৪৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সীজার রোমের সর্বেসর্বা হন।

নামে সম্রাট না হলেও সীজার একচ্ছত্র সম্রাটের মতই ক্ষমতাশালী ছিলেন। সেনেট তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেয়; আর তাঁকে স্থায়ীভাবে ডিক্টেটর মনোনীত করে। এইভাবে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রোমে প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। রোমান সাম্রাজ্য তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল। আফ্রিকার প্রায় সমস্ত উত্তর অঞ্চল, স্পেন, গ্রীস, পশ্চিম এশিয়ার কোন কোন রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশেও রোমের আধিপত্য ছিল। সেনেটের সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন সীজারের এত ক্ষমতা দেখে শঙ্কিত হন এবং তাঁরা ৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ষড়যন্ত্র করে সীজারকে হত্যা করেন। এই ঘটনা নিয়ে বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার নামক একটি নাটক আছে।

সীজারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

সীজারের মৃত্যুতে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তাঁর পোষ্যপুত্র অক্টেভিয়াস তা দূর করেন। তিনি ৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং নিজেকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনিই হলেন রোমের প্রথম সম্রাট। ইতিহাসে অক্টেভিয়াস সম্রাট অগস্টাস নামে পরিচিত। তাঁর আমলে শিল্পে ও সাহিত্যে রোমের

রোমের প্রথম সম্রাট

এমন উন্নতি হয় যে, তাঁর রাজত্বকাল রোমের ইতিহাসে 'সুবর্ণযুগ' নামে খ্যাত। এই যুগেরই বিখ্যাত কবি ছিলেন ভার্জিল, হোরেস ও ওভিদ; আর লিভি ছিলেন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমের সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। রোমে অনেক দেশ থেকে নানারকম জিনিস আমদানী হতে লাগল। রোমের মত শোভা ও ঐশ্বর্য সাম্রাজ্যের আর কোনও শহরে ছিল না। রোমে এখনও যেসব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।



অগস্টাস

ফোরাম

রোমের নাগরিকরা বিচার প্রভৃতি কাজের জন্ম যেখানে মিলিত হতেন তাকে ফোরাম বলা হত। জুলিয়াস সীজার একটি নতুন ফোরাম তৈরি করেন। রোমানরা গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে অ্যাম্পিথিয়েটার নির্মাণ করে। রোমের কলোসিয়াম খুব বড় ছিল। এই জায়গায় হাজার হাজার লোক পাথরের আসনে বসে নানারকম খেলা দেখত। রোমের কলোসিয়ামে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বসতে পারত।

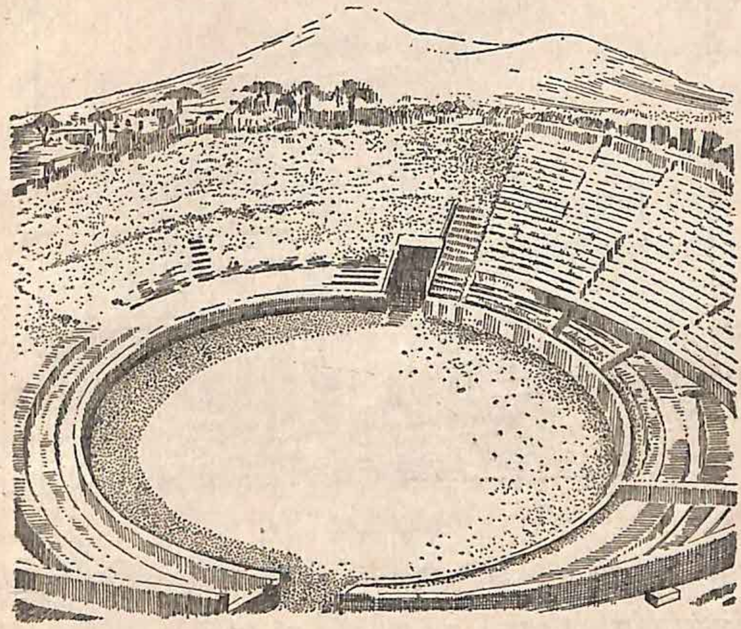
অ্যাম্পিথিয়েটার ও কলোসিয়াম

অ্যাম্পিথিয়েটারে অথবা কলোসিয়ামে কখনও কখনও দুজন অথবা অনেক লোক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। সাধারণতঃ এক পক্ষের মৃত্যু না হলে এ খেলা শেষ হত না। কখনও কখনও মল্লযোদ্ধার সঙ্গে হিংস্র জীবজন্তুর লড়াই হত। রোম ও অন্যান্য শহরে স্নানাগার নির্মাণ করা হয়; এখানে স্নানের ও সাঁতারের ব্যবস্থা ছিল।

কোথাও কোথাও এই সঙ্গে ব্যায়ামাগার ও লেখাপড়া করবার জন্য গ্রন্থাগার থাকত। সাম্রাজ্যের সর্বত্র পথঘাট, হাসপাতাল ও প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

স্নানাগার, পথঘাট, হাসপাতাল

সে যুগে রোমের আইনের খুব মর্যাদা ছিল। সকলের জন্য অবশ্য এক আইন ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভাল ভাল জিনিস



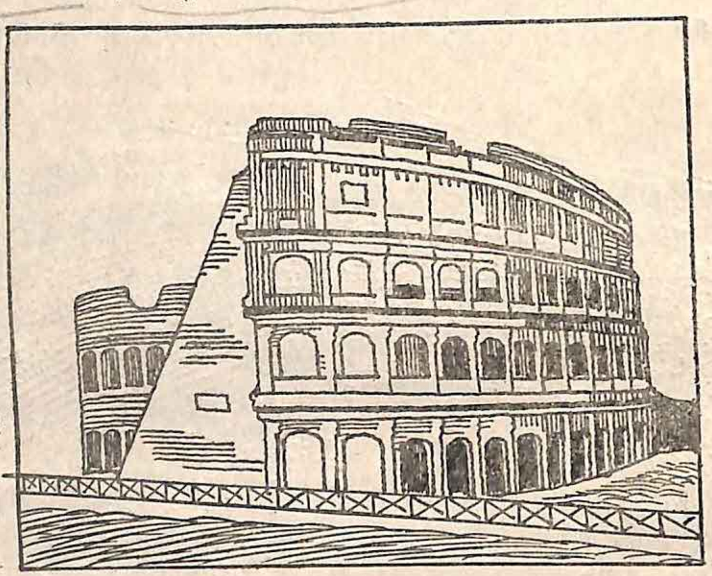
রোমান অ্যাম্পিথিয়েটার

আমদানী হত বলে রোমের মহিলারা খুব বিলাসী হয়ে ওঠেন। চীনদেশের রেশম, ভারতবর্ষের মসলিন ও হীরা মুক্তা ছাড়া তাঁদের মন ভরত না। তার ফলে রোম থেকে অনেক টাকা বিদেশে চলে যেত।

ঐশ্বর্য ও সম্পদ বৃদ্ধির ফলে রোমের সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ শিথিল হয়ে পড়ে। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তাদের আর্থিক ক্ষমতাও হ্রাস পায়। সম্রাটদের স্বেচ্ছাচারিতা শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। অগস্টাসের পরবর্তী রোমান

সম্রাটদের শাসনকালে তা প্রকাশিত হয়। ক্যালিগুলা নামে একজন সম্রাট ছিলেন, তাঁর অনেক নিষ্ঠুরতার কাহিনী শোনা যায়। আর একজন সম্রাটের নাম হল নীরো। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার সীমা ছিল না।

সাম্রাজ্যের পতন



কলোসিয়াম

আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। গথ, ভ্যাণ্ডাল, হূণ প্রভৃতি যাযাবর জাতির দ্বারা রোমান সাম্রাজ্য বারে বারে আক্রান্ত হয়। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সম্রাট কনস্টানটাইন (৩২৩-৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) রোম থেকে রাজধানী বাইজেনটিয়ামে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর নামে এই শহরের নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। বৈদেশিক আক্রমণে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল। রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের পতন ঘটলেও প্রায় এক হাজার বছর কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলের রোমান সাম্রাজ্য টিকে থাকে।

খ্রীষ্টধর্ম : রোমান সম্রাট অগস্টাসের রাজত্বকালে যীশুখ্রীষ্ট প্যালেস্টাইনের বেথেলহেম শহরের একটি আস্তাবলে জন্মগ্রহণ

করেন। যীশুর পিতার নাম যোসেফ, মায়ের নাম মেরী। যীশুর জন্মের সময় কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি একজন মহাপুরুষ হবেন। যোসেফ ছুতারের কাজ করতেন। যীশু ছেলেবেলায় লেখাপড়া করবার বিশেষ সুযোগ পাননি। তাঁকেও কিছুদিন ছুতারের কাজ করতে হয়। সেকালে ইহুদীদের মধ্যে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে জন অন্যতম। তিনি বলতেন, পাপের জন্য অনুতাপ করলে ও পবিত্রভাবে জীবন কাটালে ঈশ্বর করুণা করেন। জনের কাছে যীশুর বালক বয়সে দীক্ষা হয়। জুডার রাজা হেরডের একটি অসঙ্গত ইচ্ছার প্রতিবাদ করায় জন কারাগারে বন্দী হন ও তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। যীশু জনের ধর্মপ্রচারের অসমাপ্ত কাজ গ্রহণ করেন।

সাধু জন



যীশুখ্রীষ্ট

যীশুখ্রীষ্ট সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম-প্রচার করতে লাগলেন। তখন তাঁর সামান্য কয়েকজন শিষ্য ছিল। ধীরে ধীরে তাঁর ভক্তের দল বাড়তে লাগল। তিনি প্রচার করলেন, ভগবানের রাজ্যে অবিচার নেই। অচিরে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই রাজ্যের অধিকারী হবে তারা যারা ভগবানের অভিপ্রেত কার্য করে।

যীশুর ধর্মপ্রচার

ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যীশু রোগীর সেবা করতেন। তাঁর ধর্ম হল অহিংসার, মৈত্রী, শান্তি ও ন্যায় তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র। প্রেমের ও ক্ষমার ধর্ম।

রাজনীতি সম্বন্ধে যীশু কোন কথা বলেননি। তবুও অনেকের মনে

সন্দেহ হল, যীশু বিধাতার রাজ্যের কথা প্রচার করে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন। গোঁড়া ইহুদীদের কপট আচরণ সমালোচনা করায় যীশু তাদের বিরাগভাজন হলেন। যীশুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। তখনকার নিয়ম অনুসারে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন।

যীশুর প্রাণদণ্ড

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। খ্রীষ্টধর্ম এশিয়া-মাইনর, গ্রীস ও রোমে প্রসারিত হয়। প্রধানতঃ দরিদ্র, ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই এই ধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টধর্মকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে রোমান সম্রাট নীরো খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। পরবর্তীকালে রোমান সম্রাটরা খ্রীষ্টানদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেন। কিন্তু নির্যাতন সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের সমর্থকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি আদেশ জারী করে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে আইনত অধিকার দান করেন এবং পরে তিনি নিজেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আর কোন বাধা রইল না।

খ্রীষ্টধর্মের প্রসার

নবম পরিচ্ছেদ

চীনের অবস্থা ঃ কনফুসিয়াসের কথা

পূর্বেই বলা হয়েছে শাং রাজবংশের পরে চীনে চৌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। চীনদেশে তখন অনেক সামন্ত রাজ্য ছিল। তারা চৌ রাজার অধীনতা স্বীকার করে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে চু, চি, সিন ও চীন নামক সামন্ত রাজ্যগুলি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা নিজেদের সার্বভৌম বলে ঘোষণা করে এবং চৌ

রাজাকে বার্ষিক কর দেওয়া বন্ধ করে। একদিকে চৌ রাজ্যের সঙ্গে তাদের বিরোধ চলতে থাকে ; অন্যদিকে সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যেও যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। তার ফলে সমগ্র চীন দেশে অরাজকতা চলতে থাকে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ; অনাহারে দলে দলে লোক মরে। সমাজে অনাচার ঢুকে পড়ে। জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। দুর্বল চৌ রাজার এমন সাধ্য নেই যে এই বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি স্থাপন করেন। চীনের তখন খুবই দুর্দিন।

চৌ রাজবংশ ও চীনের অবস্থা

এই দুঃসময়ে চীনের লু রাজ্যে (বর্তমান সানতুং প্রদেশ) ৫৫১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শাং রাজবংশের সন্তান। তাঁর যখন তিন বছর বয়স তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এই পরিবারের অবস্থা তখন খুবই খারাপ হয়। কনফুসিয়াসের বিধবা মাতা ও শিশুপুত্রের দুঃখের সীমা ছিল না। কিন্তু দুঃখে তাদের মুখ কখনও মলিন হয়নি। অনেক কষ্ট স্বীকার করে কনফুসিয়াস ধনুর্বিদ্যা ও সঙ্গীত শেখেন। সংসারের অনটনে অল্প বয়সেই তাঁকে চাকরি করতে হয়। চাকরি তাঁর বেশীদিন ভাল লাগেনি। উনিশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন।

কনফুসিয়াসের বাল্যকাল

বাইশ বছর বয়সে কনফুসিয়াস কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের শহরেই একটি বিদ্যালয় খোলেন। এই বিদ্যালয়ে ধনী-দরিদ্র অনেক ছাত্রের সমাগম হয়। ধনী ছাত্ররা বোধ হয় ভাল দক্ষিণা দিত, কিন্তু কম বেতন দিলে বা বেতন না দিতে পারলেও তিনি ছাত্র ফিরিয়ে দিতেন না। মেধাবী ছাত্রদের তিনি ভালবাসতেন, নির্বোধ বা অলস ছাত্রদের একেবারে পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে প্রায় তিন হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করে। তিনি সব সময় ছাত্রদের বিনীত হয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিদ্যাচর্চা করতে উপদেশ দিতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খুব খ্যাতি ছিল।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

তখন লু রাজ্যেও অরাজকতা ছিল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভের আশায় লুর সামন্ত রাজা প্রথমে কনফুসিয়াসকে ম্যাজিস্ট্রেট ও

পরে মন্ত্রী করেন। কনফুসিয়াস তিন মাসের মধ্যে শহরের অবস্থার উন্নতি করেন। চুরি-ডাকাতি কম হতে লাগল; অসাধু দোকানদাররা ভয়ে জিনিসের দাম বেশী চাইতে পারত না, গরীবের অনেক কষ্ট দূর হল। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন রইল না। অন্য জায়গার শাসনকর্তাদের ভয় হল যে, কনফুসিয়াসের প্রভাব বেশীদিন চললে লু রাজ্যের শাসকদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। তারা কনফুসিয়াসকে তাড়াবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তাদের প্ররোচনায় ভুলে লুর শাসনকর্তা আমোদ-প্রমোদে মত্ত হলেন। লুতে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কনফুসিয়াস চেষ্টা করেও দেশে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পারেন নি।

প্রশাসনিক দায়িত্ব



কনফুসিয়াস

বিফল হয়ে কনফুসিয়াস কাজ ছেড়ে দিলেন এবং কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি যেখানে গেলেন সেখানেই দেখলেন বিশৃঙ্খলা। কনফুসিয়াস প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো অন্য জায়গার লোক তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে, তিনি আবার সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু কোথাও তাঁর ডাক পড়ল না। অসাধু রাজ কর্মচারীরা তাঁকে ডাকতে ভয় পেত। তার উপর কনফুসিয়াসের শত্রুরা রটিয়ে দিল যে তাঁকে ডেকে আনলে বিপদ হবে। তিনি সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে সর্বেসর্বা হবেন।

শিষ্যদের নিয়ে ভ্রমণ: কনফুসিয়াসের বিরুদ্ধে প্রচার

কনফুসিয়াসের বয়স যখন প্রায় সত্তর হয়েছে তখন লু

রাজ্যের নতুন শাসনকর্তা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। পূর্বের শাসনকর্তার তখন মৃত্যু হয়েছে। কনফুসিয়াস ফিরে গেলেন বটে কিন্তু আর কখনও চাকরি করেননি। এর পর তিনি আরও কয়েক বছর জীবিত ছিলেন।

লু রাজ্য থেকে আমন্ত্রণ

তাঁর শেষ জীবনে দুঃখের অবধি ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যু পূর্বেই হয়েছিল। একমাত্র পুত্রেরও মৃত্যু হয়েছিল। তিনি আরও বেশী দুঃখ পেয়েছিলেন দুজন প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুতে। ৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কনফুসিয়াস যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর যথেষ্ট সমাদর হয়নি। তাঁর চেহারা খুব কুৎসিত ছিল, তার উপর পিঠে কুঁজ। কিন্তু কি করলে জীবন সুন্দর হয় সেকথা চীনারা এই কুৎসিত লোকের কাছে শিখেছে। তিনি বলতেন প্রত্যেকে সৎ আচরণ করলে সমাজের উন্নতি হবে এবং দেশের দুঃখ দূর হবে। সমস্ত সৌরজগৎ যেমন নিয়মে বাঁধা, মানুষের জীবনেও সেই রকম শৃঙ্খলা থাকা উচিত। কনফুসিয়াস অনেক বই লিখেছিলেন। তার একটিতে সেই সময়কার চীনদেশের আচার-ব্যবহার, চালচলন ও রীতিনীতির কথা আছে। তাঁর একটি ইতিহাসের বই আছে। তাতে প্রাচীনকাল থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত ইতিহাসের অনেক মালমসলা আছে। তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর একটি কবিতাগ্রন্থ আছে, তাতে তিনি সেই সময়ে প্রচলিত অনেক গান ও কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন। এই বইয়ের অনেক কবিতা এখন নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

কনফুসিয়াসের উপদেশ

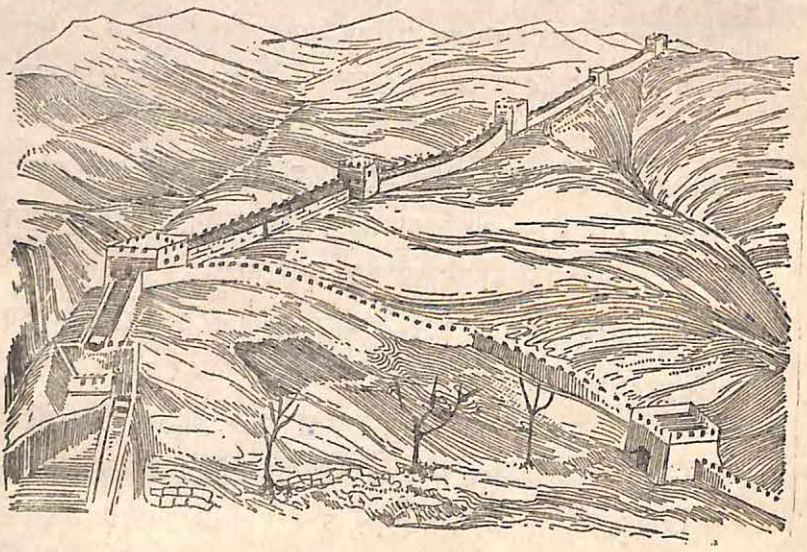
কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পরেও অনেককাল ধরে চীনের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলে। ২৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চীন রাজ্যের সৈন্যরা অনেকটা জায়গা দখল করে এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। ২৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইং চেঙ্গ চীন রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি হান, চাও, চু, ইয়েন, চি, ওয়েই ইত্যাদি রাজ্যের ক্ষমতা বিনাশ করে ২২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র চীন দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেন। চীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর চীন রাজা ইং চেঙ্গ

চীন সাম্রাজ্য

'চীনের প্রথম সম্রাট' এই পদবী ধারণ করেন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের অধিকর্তা। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে ছত্রিশটি অংশে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি শক্ত হাতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রাজ কর্মচারীদের পরিচালনা করতেন। তাঁর আমলেই চীনদেশে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তে প্রায়ই মঙ্গোলিয়ার একটি যাযাবর জাতি আক্রমণ করতে থাকে। চীনের প্রথম সম্রাটের নির্দেশে জেনারেল মেঙ্গ তিয়েন তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে এই যাযাবর জাতিকে দমন করতে যান। তিনি তাদের সীমান্তের বাইরে হটিয়ে দেন। চীনের প্রথম সম্রাট আদেশ দেন যে, বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে সমস্ত প্রাচীর চীনের উত্তরাংশ, চাও এবং ইয়েন রাজ্যগুলিতে রয়েছে সেগুলোকে সংযুক্ত করে লিনটাও (কানসু প্রদেশ) থেকে পূর্বে লিয়াও নদী পর্যন্ত এক বিরাট প্রাচীর

চীনের প্রাচীর



চীনের প্রাচীর

নির্মাণ করতে হবে। তার ফলেই চীনের বিশাল প্রাচীর নির্মিত

হয়। এই প্রাচীর চীনের কারিগরী বিদ্যায় উৎকর্ষের এক চমৎকার নিদর্শন। হাজার হাজার মজুরকে এই প্রাচীর নির্মাণ করতে বাধ্য করা হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই এই কাজ করতে গিয়ে মারা যায়। চীনের এই বিশাল প্রাচীর উত্তরের যাযাবর জাতির আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করেছিল। আজও এই প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

চীনের প্রথম সম্রাট উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করায় বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। চীন সাম্রাজ্যের আইন ছিল খুব কঠোর। এখানকার শাসকদের অত্যাচারের ফলে সাধারণ মানুষকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। তাই তারা এই সাম্রাজ্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ২০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে কৃষকরা বার বার বিদ্রোহ করে। তাতে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মধ্যেও চীনের সিংহাসন নিয়ে বিরোধ হয়। ২০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিউ প্যাঙ্গ ক্ষমতা দখল করে হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে একে পশ্চিম হান রাজবংশ বলা হয়। লিউ প্যাঙ্গ, সম্রাট কাও জু এই নামে রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন।

কৃষক বিদ্রোহ : চীন সাম্রাজ্যের পতন

দশম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষ

আর্যদের ভারতে আগমন : সিন্ধু উপত্যকার নগরবাসী সভ্য জাতি কোন্ জায়গা থেকে এসেছিল তা আমরা জানি না। তাদের পরে যে আর্যরা দলে দলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে এসে পাঞ্জাবে প্রবেশ করল, তারা ছিল বাইরের লোক। সংস্কৃত, ইরানী, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় কতক শব্দের মধ্যে মিল দেখে পণ্ডিতরা

সিদ্ধান্ত করেন যে এই চারটি ভাষাই একটি প্রাচীন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যারা সেই ভাষায় কথা বলত তারা কোথায় বসবাস করত তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কখন যে আর্যরা প্রথম এদেশে এসেছিলেন তা বলা সম্ভব নয়। এখানকার যারা প্রাচীন অধিবাসী ছিল তাদের সঙ্গে নবাগতদের সংঘর্ষ হয়। অনার্য শত্রুদের 'দাস', 'দস্যু', 'দানব' প্রভৃতি আখ্যা আর্যরা দেয়। আর্যদের নিকট পরাজিত হয়ে অনার্যরা অন্যত্র চলে যায়। এইভাবে প্রথমে পাঞ্জাবে আর্যরা কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তারপর ক্রমশঃ উত্তর ভারতে তাদের বসতি বিস্তৃত হয়।

বেদ: আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ। এই গ্রন্থে তখনকার আর্যদের ধর্মচর্চা এবং জীবনযাত্রার কথা জানা যায়। দেবতাদের তুষ্ট করবার জন্য যেসব স্তোত্র রচিত হয় তার সঙ্কলনই বেদ নামে পরিচিত। হিন্দু সভ্যতার আদি গ্রন্থরূপে বেদের খ্যাতি। বেদ চারটি—ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। এর মধ্যে ঋগ্বেদ হল সবচেয়ে প্রাচীন। প্রত্যেকটি বেদের দুই ভাগ। এক ভাগে স্তোত্র সংগ্রহ, তাকে বলে 'সংহিতা'; আর এক অংশে যাগযজ্ঞ করবার বিধি, তাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে। ঋগ্বেদে এক হাজারেরও বেশী স্তোত্র আছে। এর কিছু স্তোত্র নিয়ে সামবেদ রচিত হয়। যজুর্বেদে আছে প্রধানতঃ যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মন্ত্র। অথর্ববেদে সৃষ্টি রহস্য, শত্রু দমন, চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম মন্ত্র আছে। ব্রাহ্মণরা বেদ মুখস্থ করে রাখতেন। বেদ কতদিনের প্রাচীন ঠিক বলা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বৈদিক সাহিত্য খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-৫০০ শতাব্দীর সময় সীমার মধ্যেই রচিত হয়, কেউ কেউ বলেন আরও পূর্বে। প্রাচীন সাহিত্যে বেদের মত এত সুন্দর রচনা খুব অল্পই আছে।

বৈদিক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র: বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র পারিবারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিবার পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে চলত। মেয়েরা সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। তাঁদের যথেষ্ট

মর্যাদা ছিল। শিক্ষার সুযোগ থেকে মেয়েদের বঞ্চিত রাখা হত না। সেকালের শাস্ত্রচর্চায় মেয়েদের দান কম নয়।

পরিবার

তখন বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। লোকের নৈতিক মান উন্নত ছিল।

প্রথম বৈদিক সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব কতটা ছিল, এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে, ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। এই যুগে পুরোহিতদের পদ সম্ভবতঃ বংশগত ছিল আর অভিজাতশ্রেণীর অস্তিত্বও

জাতিভেদ প্রথা

ছিল। সেকালে জীবিকা, অসবর্ণ বিবাহ এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ না থাকায় জাতিভেদ প্রথা ততটা স্পষ্ট হয়নি।

উত্তর ভারতে আর্যরা ছোটবড় অনেক রাজ্য স্থাপন করে। তাই তারা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গ্রাম, আর কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 'বিশ' বা 'জন' সংগঠিত হয়। গ্রামের প্রধানকে বলা হত 'গ্রামণী'; 'বিশ' বা 'জন' পরিচালিত হত 'বিশপতি' বা 'রাজন' কর্তৃক। তখন রাজার ক্ষমতা

রাষ্ট্রের গঠন

সীমাবদ্ধ ছিল। রাজাকে পুরোহিত, সেনানী, গ্রামণী ও প্রবীণদের উপদেশে রাজ্য শাসন করতে হত। যুদ্ধের সময় রাজাকে সাহায্য করতেন সেনানী। বর্শা, কুঠার, তলোয়ার ও তীর ধনুকের ব্যবহার ছিল। রাজা ও বিশিষ্ট লোকেরা রথে চড়ে যুদ্ধ করতেন।

বৈদিক যুগে আর্যরা গ্রামে বাস করত; কৃষি ও পশুপালন ছিল তাদের জীবিকা। তারা সূতা ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। মৃগচর্মের পোশাকের কথাও পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কাপড়ে সোনার কাজ করা থাকত। মহিলাদের প্রসাধনের জন্য ফুলের ব্যবহার ছিল। আর্যরা ফল, মূল, অন্ন, যব প্রভৃতি আহার করত।

জীবনযাত্রা

নানারকম পশুর মাংসও তাদের খুব প্রিয় ছিল। তখন অশ্ব, মহিষ, ষাঁড় প্রভৃতির মাংস আহার করতে কোনরূপ বাধা

ছিল না। সুরাপান ও সোমরস পানের প্রচলন ছিল। আর্যরা মৃগয়া খুব ভালবাসত। নৃত্যগীত ও বীণাবাদনও তাদের খুব প্রিয় ছিল। তারা পাশা খেলতেও খুব ভালবাসত।

ধর্ম

বৈদিক আর্যরা প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বিচিত্র প্রকাশকে দেব দেবী কল্পনা করে পূজো করত। ঋগ্বেদের যুগে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল। দেবতাদের তুষ্টিবিধানের জন্য স্তবপাঠ ও যজ্ঞক্রিয়া প্রচলিত ছিল। যজ্ঞে মাঝে মাঝে পশুবলিরও কথা পাওয়া যায়।

মহাকাব্যের যুগ ঃ রামায়ণ ও মহাভারত ঃ বৈদিক যুগের শেষের দিকে রচিত হয় রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুই মহাকাব্য। অনেকে মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করেন। ব্যাসদেবকে মহাভারতের রচয়িতা বলা হয়। যুগে যুগে মহাভারতের ও রামায়ণের কাহিনীর অনেক পরিবর্তন ও সংযোজন হয়েছে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত রচিত হয় ; আর খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর কোন এক সময়ে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। ভারতীয়দের ধারণা রামায়ণ মহাভারতের পূর্বে রচিত। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না।

আর্য সভ্যতার বিস্তার

রামায়ণের কাহিনী যখন শুরু হয় তখন আর্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা। রাম, লক্ষণ ও সীতার দণ্ডকারণ্যে বাস এবং রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ কাহিনীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের আভাস পাওয়া যায়। অন্যদিকে মহাভারতে সমগ্র ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা ব্যাপ্তির ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজারা যোগদান করেন। এই দুই মহাকাব্য থেকে জানা যায়, সেকালের ক্ষমতাশালী রাজারা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা ঘোষণা করতেন। এই যুগে সমাজের বিধিনিষেধ আরও নির্দিষ্ট হয় এবং রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম : বৈদিক যুগে দেবপূজায় যাগযজ্ঞ ও পশুবলি হত। কিন্তু পরে এইসব আচার অনুষ্ঠানের প্রতি কেউ কেউ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুজন মহাপুরুষ আমাদের দেশে এই রকম নতুন ধর্ম প্রচার করেন। তাঁরা হলেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ।

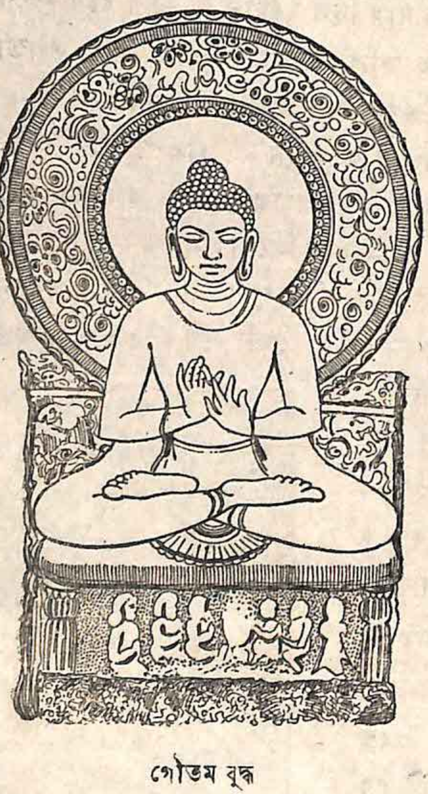
মহাবীর : উত্তর বিহারের বৈশালীর নিকটে এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। বৈশালীর রাজবংশের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। প্রথমে তাঁর নাম ছিল বর্ধমান। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন। বার বছর তপস্যা করার পর তাঁর সিদ্ধি হল। তখন তাঁর নাম হল মহাবীর বা জিন। জিন অর্থ যিনি সংসারের মোহ জয় করেছেন। তারপর ত্রিশ বছর মহাবীর বিহারের অনেক স্থান ঘুরে ধর্মপ্রচার করেন। বাহাত্তর বছর বয়সে রাজগৃহের নিকট পাবা গ্রামে তাঁর তিরোধান হয়।

তাঁর শিষ্যদের প্রথমে বলা হত নিগ্রন্থ (সাংসারিক গ্রন্থিবন্ধন বিমুক্ত)। পরে তাঁদের নাম জৈন হয়। জৈন ধর্মে জীব হত্যার মত পাপ আর নেই। অহিংসা, সত্যকথা বলা, পরের জিনিস অপহরণ না করা এবং দারিদ্র ব্রত গ্রহণ—এসবই জৈনধর্মের মূল কথা। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ায় মহাবীরের প্রচারিত নীতি সমূহকে বিভক্ত করে 'দ্বাদশ অঙ্গে' সাজানো হয়। এর পরে ধর্মীয় প্রশ্নে জৈনদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যান। বর্তমানে গুজরাট ও রাজপুতানায় জৈন সম্প্রদায়ের লোক বেশী দেখা যায়।



মহাবীর

বুদ্ধদেব : গৌতম বুদ্ধ মহাবীরের সমসাময়িক কিন্তু বয়সে ছোট। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ আমরা ঠিক জানি না। নেপালের তরাই অঞ্চলে শাক্য জাতির বাস ছিল। তারা ছিল ক্ষত্রিয়। শুদ্ধোধন ছিলেন তাদের রাজা, তাঁর রাজধানীর নাম কপিলাবস্তু। তারই নিকটে লুম্বিনী গ্রামের উদ্যানে শুদ্ধোধনের পুত্র গৌতমের জন্ম হয়; নামকরণ হয় সিদ্ধার্থ। পুত্রের শৈশবেই মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। সিদ্ধার্থের স্ত্রীর নাম যশোধরা এবং পুত্রের নাম রাহুল। বাল্যকাল হতেই সিদ্ধার্থের সংসারে আসক্তি ছিল না। এক বৃদ্ধ, এক রুগ্ন ব্যক্তি ও একটি মৃতদেহ দেখে তাঁর বৈরাগ্য আরও গভীর হল। এক সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি মনে করেন বৈরাগ্যের পথে দুঃখ নিবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যাবে।



গৌতম বুদ্ধ

একদিন রাত্রে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। তারপর তাঁর কঠোর সাধনা আরম্ভ হল। তিনি ছয় বছর গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক স্থানে তপস্যা করেন। কিন্তু শরীরকে নিগ্রহ করে তিনি দুঃখ নিবৃত্তির উপায় পেলেন না। বৌদ্ধ কাহিনীতে আছে এই অবস্থায় সিদ্ধার্থ একদিন নদীতে স্নান করে যখন বটবৃক্ষের তলায় বসেছিলেন তখন উরুবিল্ব গ্রামের একটি মেয়ে সুজাতা সোনার থালায় পায়স নিয়ে তাঁকে নিবেদন করে। তিনি সেই রাত্রে ধ্যানে বসে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি জরা ও

মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্তির সন্ধান পান। সিদ্ধার্থ সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভ করেন বলে তাঁর নাম হল বুদ্ধ।

বুদ্ধদেব কাশীর নিকটে সারনাথ নামক স্থানে প্রথমে ধর্মপ্রচার করেন। তিনি বলেন, বেশী সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা ভাল নয়, শরীরকে অনর্থক কষ্ট দিয়েও লাভ নেই, এদুয়ের মধ্য পথ অবলম্বন করা উচিত। তাঁর মতে, বাসনা থেকেই দুঃখ। আট উপায়ে এই বাসনার নিবৃত্তি হয়—সম্যগ্ দৃষ্টি, সৎসংকল্প, সৎবাক্য, সৎকর্ম, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এদের বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই অষ্ট মার্গের অনুসরণ করলে মানুষের আর কোন দুঃখ থাকে না; বুদ্ধদেবের একটি প্রধান উপদেশ ছিল কোনও প্রাণীকে হিংসা করবে না; অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করবে।

আশি বছর বয়সে কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায়) বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয়।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা মিলে তাঁর উপদেশ সমূহ সংকলন করেন। পালি ভাষায় লিখিত এই সংগ্রহকে ত্রিপিটক বলা হয়। বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের ঘটনা নিয়ে রচিত কাহিনীকে জাতক বলে।

বুদ্ধের তিরোধানের অনেক বছর পরে কয়েকটি প্রশ্নে বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং তাঁরা হীনযান ও মহাযান নামক দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যান।

মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য : উত্থান ও পতন : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ষোলটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। তাদের ষোড়শ মহাজনপদ বলা হত। তাদের মধ্যে একটি রাজ্য ছিল মগধ। বিম্বিসার সেখানকার রাজা ছিলেন। তারপর মহাপদ্মনন্দ মগধের সিংহাসন দখল করে নন্দ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাবে এসেছিলেন তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত

পালিয়ে এসে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নেন। তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর নাম চানক্য বা কৌটিল্য। তাঁর সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশকে ধ্বংস করে মগধের সম্রাট হন ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মাতার নাম মুরা। সেজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম মৌর্য। আবার কেউ কেউ বলেন, মেরিয়া নামে একটি ক্ষত্রিয় বংশে তাঁর জন্ম হয়। 'মৌর্য' নামের এও কারণ হতে পারে।

মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা

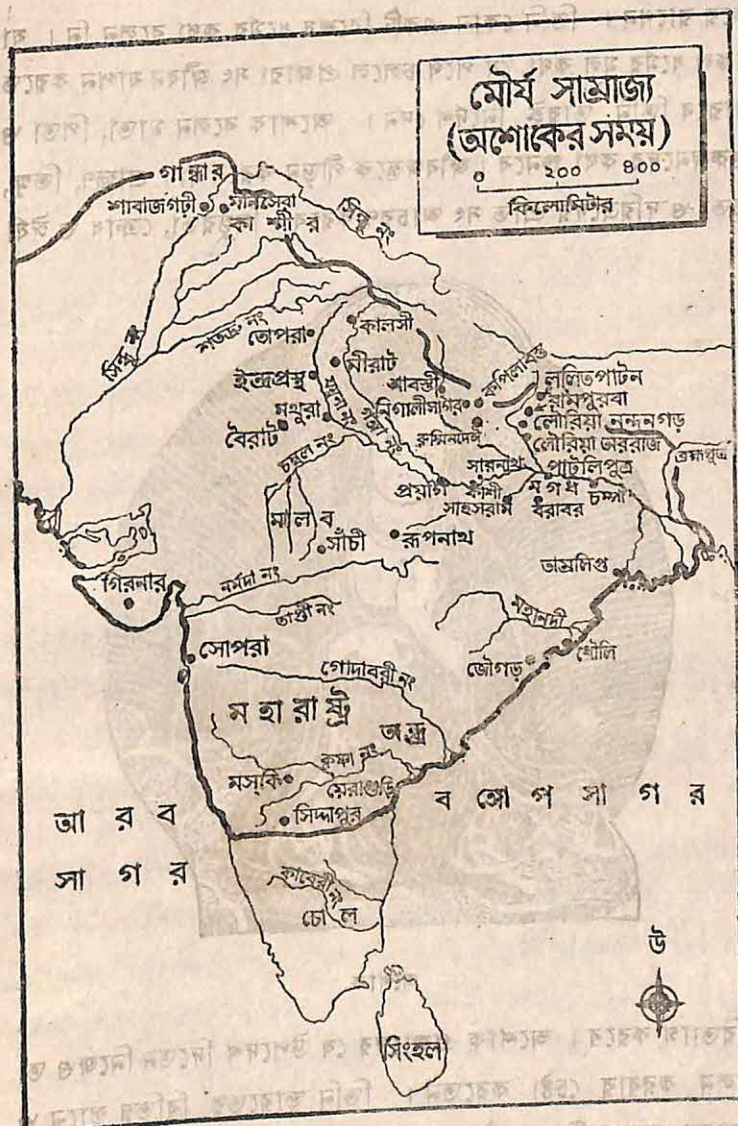
আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁকে কাবুল, কান্দাহার, হীরাট এবং বেলুচিস্তান ছেড়ে দেন। এছাড়া চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন। তিনি শেষ জীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সিংহাসন ত্যাগ করে মহীশূরের শ্রবণবেলগোলা নামক স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে স্বেচ্ছায় অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার এবং পরে বিন্দুসারের পুত্র অশোক আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে রাজা হন। রাজা হবার বার বছর পরে অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্র রাজ্যের উত্তর অংশকে কলিঙ্গ বলা হত। অশোকের শিলালিপিতে আছে যুদ্ধে এক লক্ষ কলিঙ্গবাসীর মৃত্যু হয়, দেড় লক্ষ লোক ক্রীতদাস হয়, অনাহারে ও রোগেও অনেক লোকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অশোকের মনের গতি ফিরে গেল। যুদ্ধের যে কি নিষ্ঠুর পরিণাম সেকথা তিনি বুঝতে পারেন। এর পর তিনি আর যুদ্ধ করেন নি।

অশোক

উপগুপ্ত নামে একজন ভিক্ষুর নিকটে অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ জয় হচ্ছে ধর্মবিজয়। নানা উপায়ে তিনি এই ধর্ম বিজয়ের চেষ্টা করেন। যাতে ধর্মের মূল কথাটি লোকে সহজে বুঝতে পারে সেজন্য তিনি রাজ্যের বহু জায়গায় পাথরের গায়ে ধর্ম উপদেশ খোদাই

ধর্মপ্রচার


মৌর্য সাম্রাজ্য
(অশোকের সময়)
০ ২০০ ৪০০
কিলোমিটার
গান্ধার
শাবাজগঢ়ী
মানসেরা
কাশ্মীর
সিন্ধু নং
শতদ্রু নং
তোপরা
কালসী
মীরাট
ইন্দ্রপ্রস্থ
আবস্তী
কপিলাবস্তু
ললিতপাটন
রামপুরবা
লৌরিয়া নন্দনগড়
লৌরিয়া অররাজ
মথুরা
নিগালীসাগর
বৈরাট
রুম্মিনদেই
চম্বল নং
সারনাথ
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র
প্রয়াগ
কাশী
মগধ
চম্পা
সাহসরাম
বরাবর
মালব
সাঁচী
রূপনাথ
তাম্রলিপ্ত
গিরনার
নর্মদা নং
তাপ্তী নং
মহানদী
সোপরা
জৌগড়
ধৌলি
গোদাবরী নং
মহারাষ্ট্র
অন্ধ্র
কৃষ্ণা নং
মস্কি
য়েরাগুড়ি
সিদ্দাপুর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কাবেরী নং
চোল
সিংহল
উ

করে রাখেন। তিনি কোন একটি বিশেষ ধর্মের কথা বলেন নি। যা সকল ধর্মের মূল কথা, যে পথে চললে প্রজারা সৎ জীবন যাপন করতে পারবে তিনি তারই নির্দেশ দেন। অশোক বলেন মাতা, পিতা ও গুরুজনদের কথা শুনবে। জীবজন্তুকে পীড়ন করবে না। ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, ভৃত্য ও দরিদ্রদের প্রতি সৎ আচরণ করবে। নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ ও ঈর্ষা



অশোক

পরিত্যাগ করবে। অশোক প্রজাদের যে উপদেশ দিতেন নিজেও তা পালন করবার চেষ্টা করতেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে দূত পাঠিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বড় বড় রাজার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু সকল ধর্মের লোকেদের জন্য ও সকল প্রাণীর জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করেছেন এরকম রাজার কথা ইতিহাসে আর নেই।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। তখন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বিদেশীরা এসে রাজ্য স্থাপন করে। তারা তক্ষশিলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

কুষাণজাতি

এর কিছু পরে এলো কুষাণ জাতি। এরা ছিল উত্তর-পশ্চিম চীনের ইউ-চি জাতির একটি শাখা। তারা প্রকৃতপক্ষে তুর্কী জাতীয়। তারা তাদের আদিবাস থেকে অন্য এক যাযাবর জাতির তাড়া খেয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে ভারতে চলে আসে। কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কণিষ্ক। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে তিনি রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে বা পেশোয়ারে। কণিষ্কের সাম্রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর এবং পশ্চিমে সিন্ধু ও পাঞ্জাব থেকে বারাণসী এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর সাম্রাজ্য আফগানিস্তান, ব্যাকট্রিয়া, কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখণ্ড পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কণিষ্ক যুদ্ধে চীন দেশের সম্রাটকে পরাজিত করেন এবং সন্ধির সর্ত অনুযায়ী একজন চীনা রাজকুমার তাঁর রাজ্যে বাস করতেন। মথুরার নিকট তাঁর এক কবন্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ দূর করবার জন্য তিনি কাশ্মীরে একটি বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেন।



কণিষ্কর মূর্তি

গুপ্ত যুগ

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন হবার পর অনেকদিন পর্যন্ত ভারতে কোন বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশেষে মগধে গুপ্ত সম্রাটরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্ভবতঃ ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত

সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনকাল ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে আছে সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের নয়জন রাজাকে পরাজিত করেন। দক্ষিণ ভারতেও অনেক রাজা তাঁর কাছে পরাজিত হন। সমুদ্রগুপ্তের একটি নৌবহর ছিল। হিমালয় থেকে নর্মদা আর ব্রহ্মপুত্র থেকে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তাঁর দখলে ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত



সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পশ্চিম সীমান্তের কাছে শকদের পরাজিত করে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন। এই জয়লাভের পর তিনি উজ্জয়িনীতে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী এ দুজায়গায় তাঁর রাজধানী ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য আর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একই লোক।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

তারপরে ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে বসেন কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত। দুর্দান্ত হূনদের পরাজিত করে স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

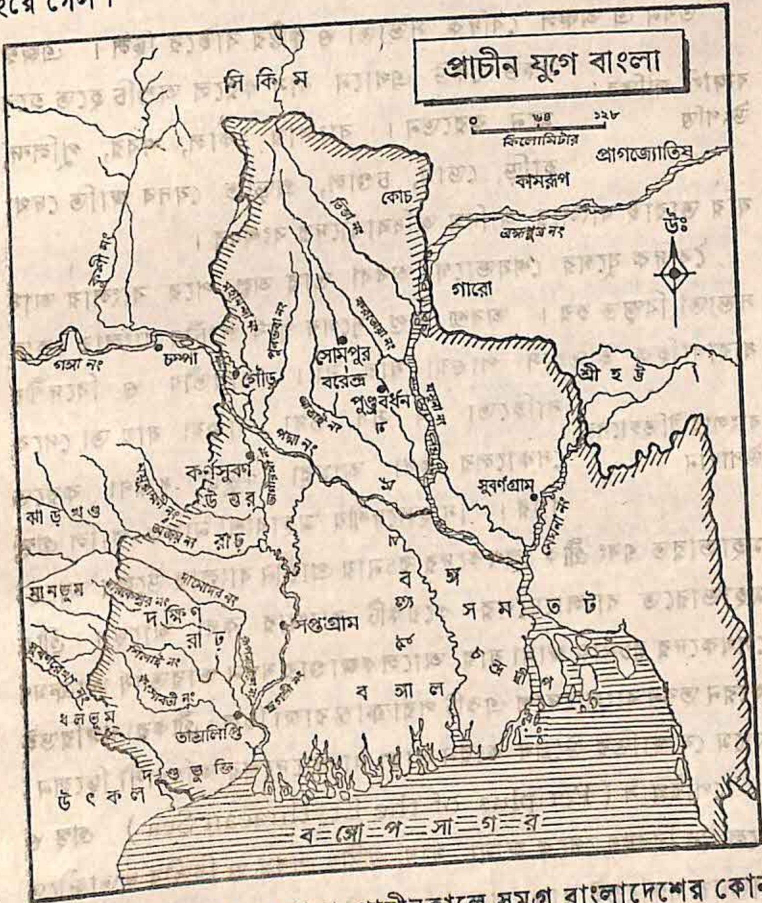
সাম্রাজ্যের পতন



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

তাঁর মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে হূনরা মালবে

আধিপত্য স্থাপন করে। বাংলা, কনৌজ, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সব কারণে গুপ্তরাজ্যের গৌরব ম্লান হয়ে গেল।



প্রাচীন বাংলার কথা : প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশের কোন একটি বিশেষ নাম ছিল না। বাংলা কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং তার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। উত্তরে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত এবং দক্ষিণে ও পূর্বে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা হত। এছাড়া উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। মুসলমান শাসকদের আমলেই এই সমস্ত দেশকে একত্রে বাংলা অথবা বাঙ্গালা বলা হয়।

সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে বাংলায় মানুষের বসতি আরম্ভ হল তা বলা কঠিন। অবশ্য এখানে আদিম মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি

তখন এ অঞ্চল বৈদিক সভ্যতা ও কৃষ্টির বাইরে ছিল। এজন্য কেউ কেউ এখানে বাস করলে অশুচি হতে হবে মনে করতেন। বাংলায় কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, প্রভৃতি যেসব জাতি দেখা যায় তারাই বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর।

বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তার অল্প পরে বাংলায় আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়। অবশ্য গুপ্ত যুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভারতীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে সেকালের কথা আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি। সিংহলদেশীয় 'মহাবংশ' নামক পালি গ্রন্থ, মহাভারত এবং গ্রীক লেখকদের রচনায় প্রাচীন বাংলার উল্লেখ আছে। মহাভারতে বাংলাদেশের কয়েকটি রাজ্যের কথা আছে। গ্রীক লেখকদের রচনায় জানা যায়, আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন বাংলাদেশে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। গ্রীকরা গঙ্গরিডই নামে যে জাতির উল্লেখ করেন তারা বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন।

বাংলার ইতিহাসের উপাদান

পেরিপ্লাস (Periplus of the Erythraean Sea) গ্রন্থ ও টলেমীর বিবরণ থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাংলায় গঙ্গরিডই রাজ্য খুব শক্তিশালী ছিল এবং গঙ্গার তীরে গঙ্গে নামক নগরী ছিল এর রাজধানী। বাংলার মসলিন কাপড় এখান থেকে সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানী হত।

বাংলায় গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠা

গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলায় কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাংলার পূর্বভাগ সমতট সমুদ্রগুপ্তের অধীনে এক করদ রাজ্য ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে সমস্ত বাংলাদেশই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত

কয়েকটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় সেখানে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত শাসকের অধীনে ছিল।

বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঃ অনেককাল আগে বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সিন্ধু নদ পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এবং আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গ্রীকদের বসতি স্থাপনের পরে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক

সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ভারত থেকে দূত প্রেরণ করা হত। ঐসব দেশের কয়েকজন রাজাও ভারতে দূত পাঠান। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। রোমে ভারতীয় দ্রব্যের খুব চাহিদা ছিল। তাই ভারতের খুব লাভ হত। চীন দেশের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ইউ-চি ও পরে কুষাণদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সময় মধ্য এশিয়ার পথে সুদূর চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বিস্তৃত হয়। পশ্চিমের ও পূর্বের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল এই মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। স্থলপথে বাইরের দেশের সঙ্গে যে পথে বাণিজ্য চলত তা চীন থেকে ভারতের উত্তরে ব্যাকট্রিয়া, সেখান থেকে আবার রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমানায় পালমিরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একে 'রেশমের রাস্তা' বলা হত। তক্ষশিলা থেকে একটি রাস্তা উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে ব্যাকট্রিয়ার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। তাম্রলিপি থেকে মথুরা-দিল্লী পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তা উত্তর পথকে সংযুক্ত করে। সেখান থেকে আর একটি রাস্তা দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে সুরাটের সঙ্গে যুক্ত হয়। উজ্জয়িনী ছিল বিভিন্ন বাণিজ্য পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। 'রেশমের রাস্তা' ধরে যে শুধু রেশম ও অন্যান্য বাণিজ্য সম্ভার যাতায়াত করত তা নয়, এই পথে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার আদান প্রদানও

'রেশমের রাস্তা'

ঘটে। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ: প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিদেশী পর্যটকরা আসতেন। তাঁদের বিবরণ থেকে সেকালের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এখানে মেগাস্থেনিস ও ফা-হিয়েন নামক দুজন পর্যটকের কথা আলোচনা করছি।

মেগাস্থেনিস: মেগাস্থেনিস নামক একজন গ্রীক রাজদূতকে সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি কিছুকাল রাজধানী পাটলিপুত্রে বাস করেন এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অনেক আগেই হারিয়ে গিয়েছে। প্রাচীনকালের অনেক গ্রীক লেখক তাঁদের রচনায় মেগাস্থেনিসের বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। এইভাবে মেগাস্থেনিসের গ্রন্থের কোন কোন অংশ রক্ষা পেয়েছে।

'ইণ্ডিকা'

মেগাস্থেনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। পাটলিপুত্রকে কুসুমপুরও বলা হত। পাটলিপুত্রের চারিদিকে একটি কাঠের প্রাচীর ছিল। তার বাইরে গভীর পরিখা, তাতে শোন নদ থেকে জল আসত। তাঁর প্রাসাদ দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ত্রিশজন সদস্য মিলে পাটলিপুত্র নগরীর শাসন-ব্যবস্থা দেখতেন। তাঁদের মধ্য থেকে পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে ছোট ছোট সমিতি গঠন করা হত। এক একটি সমিতির উপর এক একটি কাজের ভার যেমন, শিল্পকার্য, বিদেশীদের তত্ত্বাবধান, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব প্রভৃতি দেওয়া হত।

পাটলিপুত্র

চন্দ্রগুপ্ত একটি বড় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। সৈন্যদের মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক ছিল। তাছাড়া তাঁর সৈন্যরা হাতী ও রথে চড়েও যুদ্ধ করত। দূর প্রদেশগুলি রাজপ্রতিনিধিরা শাসন করতেন।

সেকালের ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে মেগাস্থেনিস উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারতবাসীরা সৎ ও সরল প্রকৃতির মানুষ। তারা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। আহার বিহার

এবং আচার ব্যবহারে তারা সংযত ও মিতাচারী। দেশে খাদ্যের অভাব নেই। মেগাস্থেনিস ভারতের খনিজ সম্পদের কথা বলেন; জলসেচ ব্যবস্থা ও পূর্তকর্মের প্রশংসা করেন।

ভারতবাসীর চরিত্র

ফা-হিয়েন: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় চীন দেশ থেকে একজন পর্যটক এইদেশে আসেন। তাঁর নাম ফা-হিয়েন। তিনি এখানে বৌদ্ধ পুঁথির সন্ধানে আসেন। যে সব শহরে বৌদ্ধরা থাকতেন, ফা-হিয়েনের সে সব জায়গা দেখবার ইচ্ছা হয়। সে জন্য তিনি পেশোয়ার, তক্ষশিলা, মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, বৈশালী, বারাণসী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ ও গয়া প্রভৃতি নগর পরিভ্রমণ করেন। তাতে তাঁর ছয় বছর সময় লাগে। ফা-হিয়েন সংস্কৃত ভাষা শিখে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাম্রলিপ্তি বন্দর হতে জাহাজে করে সিংহলে যান, সেখানে দুবছর থেকে যবদ্বীপ হয়ে দেশে ফিরে যান। তিনি আমাদের দেশ থেকে অনেক পুঁথি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ফা-হিয়েনের লেখা ভারতবর্ষের একটি বিবরণ আছে। তাতে প্রধানতঃ তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা এদেশে কিরকম ছিল সে কথা বলেন। ধর্ম ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। তাহলেও তাঁর বিবরণ পড়ে গুপ্ত যুগে দেশের অবস্থার কথা জানা যায়। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী নগরগুলোর ঐশ্বর্য দেখে ফা-হিয়েন আশ্চর্য হন। তিনি বলেন, নগরে অনেক লোকের বাস, অধিবাসীদের অবস্থাও খুব স্বচ্ছল। পাটলিপুত্রে একটি বড় চিকিৎসালয় ছিল। নগরের অধিবাসীরা এর ব্যয় বহন করত। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্মিত হন। তিনি পাটলিপুত্রে থাকবার সময় একটি বড় শোভা যাত্রা দেখেন। কুড়িটি সুসজ্জিত রথে দেবমূর্তি নিয়ে বছরে একদিন নগর প্রদক্ষিণ করা হত। শোভাযাত্রার সঙ্গে গায়ক ও বাদক থাকত। অপরাধীদের শাস্তি খুব কঠোর ছিল না, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না বললেই চলে। ইচ্ছামত

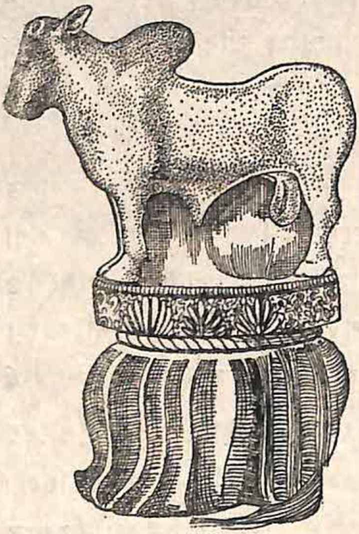
রাজ্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যেত। কোনরূপ বাধানিষেধ ছিল না।

এ দেশে যে চীনের মত বাড়িতে শূকর অথবা মুরগী পোষার রীতি ছিল না, ফা-হিয়েন সে-কথাও লেখেন। আহারের জন্য জীবহত্যা হত না। চণ্ডালেরা অবশ্য এসব বাধানিষেধ মানত না। তারা নগরের বাইরে থাকত।

ফা-হিয়েনের বিবরণীতে অনেক বৌদ্ধ সংঘারামের কথা আছে। এখানে বৌদ্ধ শ্রমণরা থাকতেন। এক মথুরা নগরেই কুড়িটি সংঘারাম ছিল। এইসব সংঘারামের জন্য ধনী লোকেরা ভূমিদান করতেন।

প্রাচীন ভারতে শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ঃ পারসিক ও গ্রীকদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতীয় শিল্পকলার উপর তাদের প্রভাব পড়ে। গ্রীক ও ভারতীয় রীতি মিশ্রিত হয়ে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হয়। এই শিল্প-রীতির নমুনা গান্ধার অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে।

শিল্পকলা

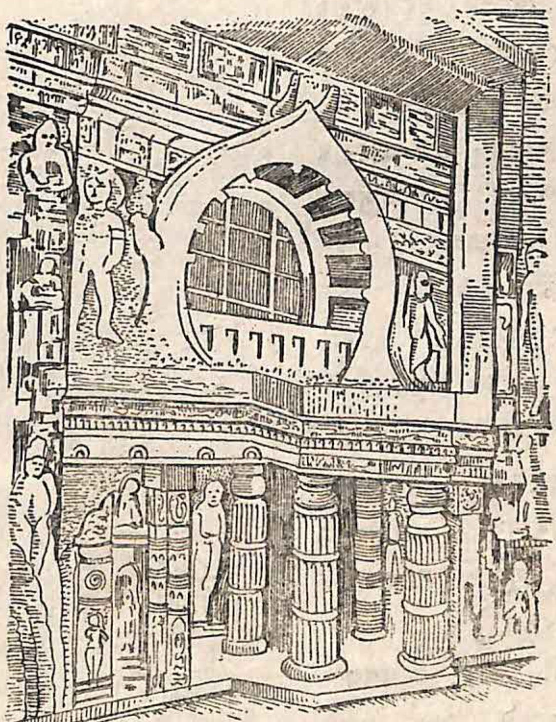


রামপুর অশোকস্তম্ভের বৃষ

অশোকের সময়ে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটে। সারনাথের স্তম্ভ-শীর্ষের সিংহমূর্তি, সাঞ্চীস্তূপ, ধৌলির হস্তিমূর্তি, অশোকস্তম্ভে বৃষমূর্তি শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। সারনাথের সিংহমূর্তি ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। কণিষ্কের সময়ে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অগ্রগতি হয়। গুপ্তযুগে অন্যান্য শিল্পকলার মত চিত্রাঙ্কণ বিদ্যারও খুব উন্নতি হয়। দক্ষিণ ভারতে আওরঙ্গাবাদের নিকট অজন্তা পাহাড়ে কয়েকটি গুহায় অনেক সুন্দর ছবির নিদর্শন আছে। গুহার গায়ে

অজন্তা গুহা

নানারকম জিনিসের প্রলেপ দিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হত। এই ধরনের ছবি আঁকার পদ্ধতিকে 'ফ্রেস্কো' বলে ; বাংলায় প্রাচীর চিত্র বলা যায়। নানারঙে বুদ্ধদেবের জীবনী, জাতকের গল্প ও হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকা আছে। শিল্পীরা সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রা, পশুপক্ষী, গাছপালার ছবিও এঁকেছেন। তাছাড়া পর্বতগাত্র



অজন্তার গুহামুখ

থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্তম্ভ, অলিন্দ, বিরাট বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি। অজন্তা গুহাগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের বাসস্থান ছিল।

মৌর্যযুগে সংস্কৃত ভাষার খুব উন্নতি হয। পানিনির ব্যাকরণ, কাত্যায়ণ ও পতঞ্জলির ভাষ্য সংস্কৃত ভাষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে। মহাকবি ভাস মৌর্যযুগেই 'স্বপ্নবাসবদত্তা' রচনা করেন। এই যুগের সংস্কৃত ভাষায় রচিত আর একটি বিখ্যাত

গ্রন্থের নাম হল 'অর্থশাস্ত্র'। অনেকের বিশ্বাস চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য এই গ্রন্থের লেখক। কণিষ্কের রাজসভায় দার্শনিক বসুমিত্র, বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যাতা নাগার্জুন, কবি অশ্বঘোষ প্রভৃতি মনীষির আবির্ভাব হয়।

গুপ্ত সম্রাটদের সময় অনেক বিখ্যাত লেখক জন্মগ্রহণ করেন। হরিসেন ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি। মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে 'রঘুবংশ', 'কুমার সম্ভব' ও 'মেঘদূত' প্রধান। সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক 'শকুন্তলা' তাঁর রচনা। বিখ্যাত নাটক 'মৃচ্ছকটিক'-এর রচিয়তা শূদ্রক, 'মুদ্রা-রাক্ষস'-প্রণেতা বিশাখদত্ত, বৌদ্ধ দার্শনিক ও সাহিত্যিক বসুবন্ধু এযুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।



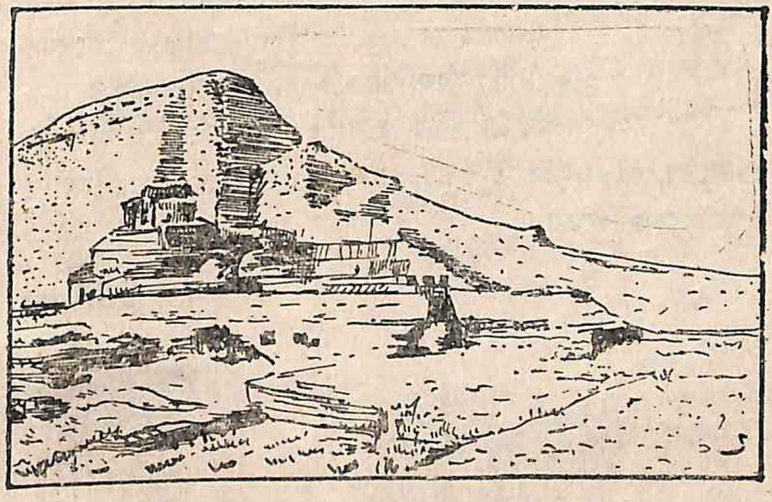
অজন্তার চিত্র

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল।

শিক্ষা

তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই খ্যাতি ছিল। সুদূর কাশী, মিথিলা, উজ্জয়িনী, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থান হতে ছাত্ররা সেখানে পড়তে যেত। পরবর্তীকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম প্রধান

কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিহারের রাজগৃহের সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁও নামক গ্রামে নালন্দা বিহার গড়ে উঠে। গুপ্ত সম্রাটদের বদান্যতায় নালন্দা এক বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। চীন, তিব্বত প্রভৃতি বহু দূর দেশ থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। এখানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, মান-মন্দির ইত্যাদি ছিল। বহুসংখ্যক



নালন্দা

শ্রমণ, ছাত্র ও অধ্যাপকদের বাসস্থানেরও ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় জ্ঞানও খুব অগ্রসর হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, পৃথিবী যে নিজের চারিদিকে ঘোরে এই তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণও জানতে পারেন। প্রায় একই সময়ে বরাহমিহির গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। পরে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত।

গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা

অথর্ববেদে চিকিৎসা বিষয়ের উল্লেখ আছে। পরে চিকিৎসাবিদ্যাকে অথর্ববেদ থেকে পৃথক করে আয়ুর্বেদ বা পঞ্চমবেদ রচিত হয়। আত্রেয়, সুশ্রুত, চরক ও জীবক সে যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক

ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিটি বিভাগই উন্নত ছিল। মৃতদেহ কেটে শরীরবিদ্যা চর্চা করা, নানারকম ঔষধ ব্যবহার করা এবং অস্ত্রোপচার ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের এত খ্যাতি ছিল যে অনেক গ্রন্থের আরবী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়।

চিকিৎসা বিদ্যা

ভারতে রসায়নশাস্ত্রের চর্চাও প্রাচীন। ধাতু শিল্পসংক্রান্ত কারিগরী বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে রসায়ন-বিদ্যার চর্চাও চলতে থাকে। আয়ুর্বেদের প্রয়োজনেই রসায়নের প্রভূত উন্নতি হয়। সুশ্রুত ও চরক সেকালের বিখ্যাত রসায়নবিদও ছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্র

পরিশিষ্ট

ঘটনাপঞ্জী

সময় বোঝাবার জন্য যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হতে কাল গণনা করা হয়। যীশুর জন্মের পূর্বকালকে খ্রীষ্টপূর্ব বলা হয়, জন্মের পরের কালকে বলা হয় খ্রীষ্টাব্দ। যেমন খ্রীষ্টপূর্ব ১০ বললে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দশ বছর পূর্বেকার সময় বুঝতে হবে। পণ্ডিতরা বলেন যে বছরকে যীশুর জন্ম সময় বলে মনে করা হয়, তিনি প্রকৃতপক্ষে তার চার বছর পূর্বে জন্মেছিলেন। কিন্তু তা হলেও পূর্বেকার গণনার কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রাচীন ইতিহাসের সব ঘটনার ঠিক সময় দেওয়া সম্ভব নয়। নীচের তারিখগুলোর কয়েকটি আনুমানিক এবং কয়েকটি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

খ্রীষ্টপূর্ব

৫০০,০০০-২০০,০০০	...	পিকিং মানুষ
৫০,০০০-৫,০০০	...	প্রস্তর যুগ
৩০০০-২৫০০	...	পিরামিড যুগ
৩০০০	...	সিন্ধু সভ্যতা
৩০০০-১২০০	...	ঈজিয়ন সভ্যতার গৌরবময় যুগ
২১২৩-২০৮১	...	হামুরাবির রাজ্যকাল
২০০০-৫০০	...	বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল
২০০০-১৫২০	...	চীনের সীয়া রাজবংশ
১৮০০-১০০০	...	লৌহযুগের সূত্রপাত
১৫২০-১০৩০	...	চীনের শাং রাজবংশ
১৪৭৯-১৪৪৭	...	তৃতীয় থাটমোস
১৩৫৮	...	ইখনাটনের মৃত্যু
১২২৫	...	দ্বিতীয় রামেসিসের মৃত্যু
১২০০	...	টুটেন্‌খামেন
১২০০ হতে	...	ফিনিশীয়দের অভ্যুদয়
১০৩০	...	চৌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা
৮১৩	...	কার্থেজ শহরের পত্তন
৭৫৩	...	রোম নগরীর পত্তন
৬৬০-৫৮৩	...	জরথুষ্ট্র
৬০৫-৫৬২	...	দ্বিতীয় নেবুকডনেজার

৫৫১-৪৭৯	...	কনফুসিয়াস
৫৫০-৫২৯	...	সাইরাসের রাজ্যকাল
৫২৭	...	মহাবীরের তিরোধান
৫২১-৪৮৫	...	ডেরিয়াসের রাজ্যকাল
৪৮৬	...	বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভ
৪৮৫-৪৬৪	...	জারক্সেসের রাজ্যকাল
৪৬৯-৩৯৯	...	সক্রেটিস
৪২৯	...	পেরিক্লিসের মৃত্যু
৩৫৯-৩৩৬	...	ফিলিপের রাজ্যকাল
৩৩৬-৩২৩	...	আলেকজাণ্ডারের রাজ্যকাল
৩২৬-৩০২	...	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
২৭৩-২৩২	...	অশোকের রাজ্যকাল
২৬৪-২৪১	...	প্রথম পিউনিক যুদ্ধ
২২১	...	ঐক্যবদ্ধ চীনদেশ
২১৮-২০২	...	দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ
১৪৯-১৪৬	...	তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ
১৪৬	...	কার্থেজের ধ্বংস
৭৩-৭১	...	ইটালিতে ক্রীতদাস বিদ্রোহ
৪৪	...	জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু
৩১	...	রোমের প্রথম সম্রাট অগস্টাস
৪	...	যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রকৃত তারিখ

খ্রীষ্টাব্দ

৩০	...	যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ
৫৪-৬৪	...	নীরোর রাজ্যকাল
৩২০-৩০	...	প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল
৩২৩-৩৩৭	...	কনস্টানটাইনের রাজ্যকাল
৩৩০-৩৭৫	...	সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল
৩৮০-৪১৩	...	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল
৪০৫-৪১১	...	ফা-হিয়েনের গুপ্ত সাম্রাজ্যে অবস্থান
৪৫৫-৫০০	...	হূণ আক্রমণ
৪৭৬	...	পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন

॥ অনুশীলনী ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(২) কি উপায়ে প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় সংক্ষেপে বল।

(৩) অতীতকালের মানুষের ব্যবহারের জিনিসপত্র কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(১) মাটি খুঁড়ে কি কি জিনিস পাওয়া গিয়েছে? (২) অতীত ইতিহাস জানতে প্রাচীন মুদ্রা কিভাবে সাহায্য করে? (৩) প্রাচীন মানুষ লেখার জন্য কি ব্যবহার করত? (৪) ব্রাহ্মীলিপি কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর : (ক) ইতিহাস—করলে আমাদের—বৃদ্ধি পাবে। (খ) সব প্রাচীন—এখনও পড়তে পারা যায়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) পৃথিবীতে আদিম মানুষের আবির্ভাব কিভাবে হল?

(২) 'পিকিং মানুষ' কাদের বলা হয়? তাদের সম্বন্ধে যা জান বল।

(৩) আদিম মানুষ কিভাবে আগুনের ব্যবহার করতে শেখে? আগুনের ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবন কিভাবে বদলে যায়?

(৪) প্রস্তর যুগ কাকে বলে? প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের অস্ত্র কি ধরনের ছিল?

(৫) নতুন প্রস্তর যুগ বলা হয় কেন? এই যুগে মানুষ কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত?

(৬) নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে খাদ্য-সংগ্রাহকের জীবন পরিত্যাগ করে খাদ্য-উৎপাদকের জীবন অবলম্বন করে? সেকালের মানুষের কৃষিকার্য ও পশুপালন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৭) অতীতকালের মানুষের শিল্পকলা চর্চার বিবরণ দাও।

(৮) নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(১) পিকিং মানুষ কোথায় পাওয়া গিয়েছে? (২) কোন্ সময়ে মানুষ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত? (৩) নতুন প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলোর বৈশিষ্ট্য কি ছিল? (৪) আগুন আবিষ্কারের ফলে মানুষ কি কি জিনিস সহজে নির্মাণ করতে পারে? (৫) কোন্ সময় থেকে মানুষের মনে শিল্প রচনার ইচ্ছা জাগে?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ (ক) প্রথমে পৃথিবীতে—কোন চিহ্ন ছিল না। (খ) সম্প্রতি চীনের পণ্ডিতরা—করে পিকিং মানুষ সম্পর্কে আরও অনেক—পেয়েছেন। (গ) আদিম মানুষের সবচেয়ে বড়—আগুন—শেখা। (ঘ) উত্তর স্পেনের—গুহায় যে জীবজন্তুর অপূর্ব চিত্র দেখা যায় তা তো প্রস্তর যুগের মানুষের কীর্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) তামা ও ব্রোঞ্জ কিভাবে আবিষ্কৃত হয়? তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ কেন বলা হয়?

(২) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের কৃষিজীবী ও পশুপালকদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৩) কি কারণে বড় বড় নদীর ধারে সভ্যতা গড়ে ওঠে? শহর কিভাবে গড়ে ওঠে?

(৪) কি করে বাজারের সৃষ্টি হল? তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কি পরিবর্তন দেখা যায়?

(৫) সমাজে কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়? কি কি কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল?

(৬) রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি করে হল? তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ (১) কিভাবে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়? (২) কোন্ ধাতুর ব্যবহার সবচেয়ে প্রাচীন? (৩) কোন্ কোন্ দেশে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের পরিচয় পাওয়া যায়? (৪) প্রথমে কোথায় সভ্যতার বিকাশ হয়? (৫) শহরের উৎপত্তি হল কি ভাবে? (৬) কাদের ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করা হত? (৭) কিভাবে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য দেখা দিল।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ (ক) সোনার সাথে—প্রস্তর যুগের মানুষের যে পরিচয় ছিল তার—পাওয়া যায়। (খ) সাগরের—যেমন প্রথম জীবনের সঞ্চার হয় তেমনি—আরম্ভ হয় বড় বড় নদীর তীরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥ মেসোপটেমিয়া

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ কি? এই অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?

(২) সুমেরীয়রা কিভাবে বন্যা প্রতিরোধ করত? তারা চাষের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল?

(৩) কিউনিফর্ম বা কীলকলিপি কাকে বলে?

(৪) সুমেরীয়দের ধর্ম ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যা জান বল।

(৫) কোন্ কোন্ অঞ্চল খনন করে সুমের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়? সুমেরীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সম্বন্ধে কি জান?

(৬) সুমের সভ্যতার পতন কি করে হল তার বর্ণনা দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (১) সুমেরীয় লিপিকে ইংরেজীতে কি বলা হয়? (২) সুমেরীয়রা কিসের উপর লিখত? (৩) মেসোপটেমিয়ার লোকেরা কি কি কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল? (৪) গিলগামেস কে ছিলেন? (৫) গিলগামেসের বীররসাত্মক কাব্য কোথায় পাওয়া গিয়েছে?

(ক) মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন লিপিকে কি বলে? **ডান দিকে ✓ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও।**

ব্রাহ্মী ☐
হায়ারোগ্লিফিক ☐
কিউনিফর্ম ☐

॥ দুই ॥ মিশর

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নঃ

(১) মিশর কোথায়? মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন?

(২) ফ্যারাও শব্দের অর্থ কি? পিরামিড কাকে বলে?

(৩) মিশরের প্রাচীন লিপি সম্বন্ধে আলোচনা কর?

(৪) মিশরের কৃষকরা ও কারিগররা কি কি জিনিস উৎপন্ন করত?

(৫) মিশরের দেবদেবী ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান বল।

(৬) মিশরের শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে কি জান?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (১) ম্যমি কাকে বলে? (২) সবচেয়ে বড় পিরামিড কোথায় আছে? এই পিরামিডটি কে নির্মাণ করেছিলেন? (৩) অ্যামনের মন্দির কোথায়? (৪) মিশরের প্রাচীন লিপিকে ইংরেজীতে কি বলে? (৫) পেপিরাস কি এবং কি কাজে লাগত?

॥ তিন ॥ সিন্ধু উপত্যকা

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নঃ

(১) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা কোথায়? কারা এই দুই অঞ্চলের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন?

(২) সিন্ধু উপত্যকায় কি লিখিত জিনিস পাওয়া গিয়েছে?

(৩) সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা কি কি দেবদেবী পূজো করত তা লেখ।

(৪) এখানকার অধিবাসীদের শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৫) সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (১) মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ ও হরপ্পার ভগ্নাবশেষ

কখন আবিষ্কৃত হয়? (২) এখানে কি কোন লিপি পাওয়া গিয়েছে? (৩) সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা কোন্ কোন্ শিল্পে পারদর্শী ছিল?

(ক) সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কারের অবদান আছে এমন **চারজনের নামের পাশে ✓ চিহ্ন দাও ঃ**

শাম্পলিয়ঁ	☐	হেরোডোটাস	☐
মেগাস্থেনিস	☐	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	☐
দয়ারাম সাহানী	☐	স্যার জন মার্শাল	☐
কাশীনাথ দীক্ষিত	☐	ননীগোপাল মজুমদার	☐
মার্টিমার হুইলার	☐		

(খ) নীচের প্রথম সারিতে কয়েকটি **স্থানের নাম** এবং দ্বিতীয় সারিতে কয়েকটি **নদীর নাম** দেওয়া আছে। **সামঞ্জস্য রেখে সাজিয়ে দাও ঃ**

মেসোপটেমিয়া ... ... সিন্ধুনদী
মহেঞ্জোদড়ো ... ... নীল নদ
চীন ... ... ইউফ্রেটিস নদী
মিশর ... ... হোয়াংহো নদী

॥ চার ॥ চীন

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) কিভাবে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় সভ্য সমাজ গড়ে ওঠে?
(২) বন্যা প্রতিরোধ সম্বন্ধে চীনের প্রচলিত কাহিনী লেখ।
(৩) শাং রাজবংশ সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(৪) ইনের ধ্বংসস্তূপ কাকে বলে? এখানে যেসব জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার সাহায্যে সংক্ষেপে সেকালের চীনের জীবনযাত্রা আলোচনা কর।
(৫) চীনের লিপি সম্বন্ধে যা জান বল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ (১) হুয়াংটি কে ছিলেন? (২) কখন চীনে কাঠি দিয়ে ভাত খাবার পদ্ধতির প্রচলন হয়?

নীচের শহরগুলো কোন্ কোন্ দেশে অবস্থিত তা ডানপাশে লেখ।

উর— ইন—
গিজে— নিনেভে—
হরপ্পা—

॥ পাঁচ ॥ প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

(১) প্রাচীন সভ্যতাকে কৃষিপ্রধান সভ্যতা বলা হয় কেন? 'উপগ্রহ সভ্যতা' কাকে বলে?

(২) নদীমাতৃক সভ্যতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৩) প্রাচীন সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৪) নদীমাতৃক সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) কখন ও কোথায় প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু হয়? লৌহ শিল্পে কাদের প্রাধান্য ছিল?

(২) লৌহযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৩) লৌহ যুগ সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ (১) হিটাইটরা কোথায় বাস করত? (২) কোন্ অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে লৌহযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে? কাদের আক্রমণে নসস্-এর ব্রোঞ্জ সভ্যতার পতন ঘটে?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ (ক) লোহা তৈরির ব্যাপারে এশিয়া-মাইনরের— প্রায়—কর্তৃত্ব ছিল। (খ) আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ভারতীয়রা খুব উন্নত মানের—তৈরি করতে জানত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥ ব্যাবিলন

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ব্যাবিলন সাম্রাজ্য কিভাবে গড়ে ওঠে? এখানকার লোকেরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করত?

(২) হামুরাবি কে ছিলেন? কোন্ কোন্ সূত্র থেকে তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি?

(৩) 'হামুরাবির আইন' উল্লেখ করে তৎকালীন সমাজ জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৪) ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

॥ দুই ॥ মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ উত্থান ও পতন

(৫) মিশরের ইতিহাসে কোন্ সময়কালকে 'সামরিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ' বলে উল্লেখ করা হয়?

(৬) তৃতীয় থাটমোস কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৭) ইখনাটন্‌কে ইতিহাসের প্রথম পয়গম্বর বলা হয় কেন?

॥ তিন ॥ প্রাচীন ইরান

(৮) পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৯) ডেরিয়াস কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

(১০) জরথুষ্ট্র কে ছিলেন? অবেস্তা কাকে বলে?

॥ চার ॥ ইহুদীদের কথা

(১১) মোজেস্ কে ছিলেন? তিনি কিভাবে ইহুদীদের ফ্যারাও-এর দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন?

(১২) জিহোবা কে ছিলেন? ইহুদী ধর্মের মূলকথা আলোচনা কর।

(১৩) রাজা সলোমন কে ছিলেন? তাঁর নাম কেন বিখ্যাত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (১) ব্যাবিলনের একজন শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কর। (২) কোন্ রাজা প্রথম আইন-কানুন সঙ্কলন করেন? (৩) অসুরবাণীপাল কে ছিলেন? (৪) মিশরে কাকে বড় সেনাপতিদের একজন বলা হয়? (৫) ডেরিয়াসের বিজয়ের কথা কোথায় খোদাই করা আছে? (৬) ইরানের মঙ্গলময় ও অমঙ্গলের দেবতার নাম কি? (৭) কোথায় ইহুদীদের ধর্মের কথা আছে? (৮) ডেভিড কে ছিলেন?

প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে কে প্রথম আইন-কানুন সঙ্কলন করেন? ডান দিকে ✓ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তর দেখাও:

তৃতীয় থাটমোস	☐	অসুরবাণীপাল	☐
ডেরিয়াস	☐	নেবুকডনেজার	☐
হামুরাবি	☐		

পারস্য সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন? ডান দিকে ✓ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও:

ক্যামবেসিস্	☐	ডেরিয়াস	☐
জারক্সেস	☐	সাইরাস	☐
আলেকজাণ্ডার	☐		

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন:

(১) ঈজিয়ন সভ্যতা সম্পর্কে যা জান বল?

(২) গ্রীকদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? কিভাবে তারা গ্রীসে আধিপত্য স্থাপন করে?

(৩) হোমার কে ছিলেন? হোমারীয় যুগের সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(৪) গ্রীক দেবদেবীর বিষয়ে যা জান লেখ।

(৫) এথেন্সের সমাজ জীবনের পরিচয় দাও।

(৬) স্পার্টার শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(৭) সক্রেটিস কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(৮) পুরুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধের বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (১) গ্রীক অধ্যুষিত দেশকে 'হেলাস' বলা হত কেন? (২) এপোলো কে ছিলেন? (৩) গ্রীক দেবতাদের রাজার নাম কি? (৪) পার্থেনন কিসের জন্য বিখ্যাত? (৫) কাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়?

ঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাওঃ
(ক) সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস ছিলেন—রাষ্ট্রনেতা, ঐতিহাসিক, নাট্যকার।
(খ) অ্যাক্রপলিস ছিল—রাজধানী, মন্দির, গিরিদুর্গ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নঃ
(১) রোমিউলাস ও রেমাসের কাহিনী সম্বন্ধে যা জান বল।
(২) রোম-কার্থেজ যুদ্ধের কারণ কি?
(৩) হানিবল কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(৪) রোমের সমাজ-ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(৫) জুলিয়াস সীজারের কথা কি জান?
(৬) রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
(৭) যীশুখ্রীষ্টের জীবনের কথা সংক্ষেপে বল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ (১) হামিলকার বার্কা কে ছিলেন? (২) স্পার্টাকাস কে ছিলেন? (৩) অ্যাম্পিথিয়েটার অথবা কলোসিয়ামে কি হত? (৪) যীশুখ্রীষ্টকে কেন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়?

কানের যুদ্ধে কে জয়ী হন? √ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাওঃ

হামিলকার বার্কা	☐	হাসড্রুবাল	☐
হানিবল	☐	কেটো	☐

নবম পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নঃ
(১) কনফুসিয়াসের জীবনের কথা যা জান লেখ।
(২) কি কারণে চীনের বিশাল প্রাচীর নির্মিত হয়?

শূন্যস্থান পূরণ করঃ (ক) কনফুসিয়াস অনেক — লিখেছিলেন।
(খ) ২০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিউ প্যাঙ্গ ক্ষমতা দখল করে — রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

(১) আর্যরা ভারতবর্ষে এসে কিভাবে বসতি বিস্তার করেছিল ?

(২) বেদ কয়ভাগে বিভক্ত ? বেদ থেকে আমরা কি জানতে পারি ?

(৩) বুদ্ধের জীবনী বল। তিনি কি শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

(৪) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৫) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?

(৬) সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যা জান বল।

(৭) কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল ? রেশমের রাস্তার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(৮) মেগাস্থেনিস কে ছিলেন ? তাঁর বিবরণ থেকে ভারতীয় সমাজের কি চিত্র পাওয়া যায় ?

(৯) ফা-হিয়েন কখন এদেশে এসেছিলেন ? তাঁর বিবরণ থেকে দেশের অবস্থা সম্পর্কে কি জানা যায় ?

(১০) প্রাচীন ভারতে শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা কি রকম হয়েছিল বল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (১) কোন্ পথে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল ? (২) 'দ্বাদশ অঙ্গ' বলতে কি বুঝায় ? (৩) বৌদ্ধরা কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ? (৪) কোন্ সম্রাট 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন ? (৫) কোন্ অঞ্চলকে 'রেশমের রাস্তা' বলা হত ? (৬) অজন্তা গুহা কিসের জন্য বিখ্যাত ? (৭) কালিদাস কেন বিখ্যাত হল ? (৯) আর্যভট্ট কি আবিষ্কার করেছিলেন ?

শুদ্ধ করে পাশাপাশি সাজাও :

অশোক	...	...	নন্দবংশ ধ্বংস করেন
চন্দ্রগুপ্ত	...	...	কলিঙ্গ দেশ জয় করেন
কণিষ্ক	...	...	তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	...	...	তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে

নিম্নলিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোন্‌টি ? ডান দিকে √ চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও :

(ক) নালন্দা

একটি বৌদ্ধমন্দির ☐ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ☐
একটি হিন্দু ধর্ম মন্দির ☐ একটি দুর্গ ☐

(খ) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

বিন্দুসার ☐ চন্দ্রগুপ্ত ☐
কণিষ্ক ☐ সমুদ্রগুপ্ত ☐